সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

এমফিল গবেষণার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

নাসিমা বেগম

রেজিট্রেশন নং- ৩০

শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-২০১৪

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ।

সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

এমফিল গবেষণার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।

সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

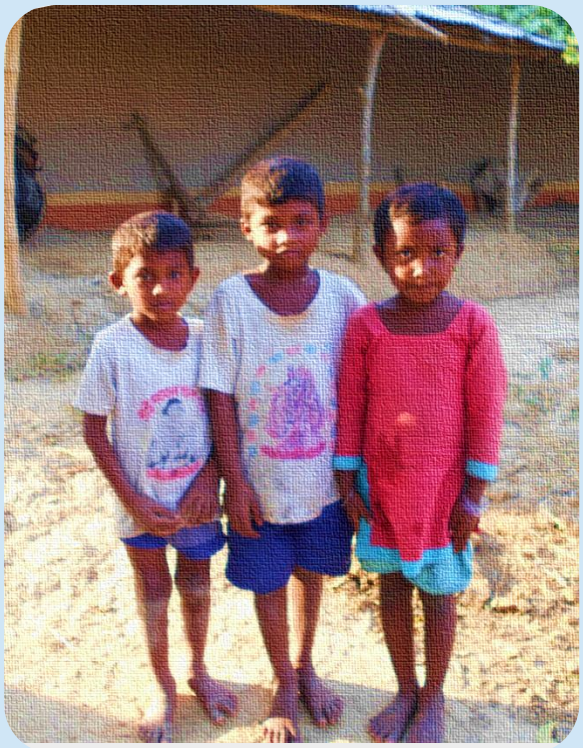

এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

আমি নাসিমা বেগম এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে আমার এমফিল গবেষণার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হল। এটি একটি মৌলিক গবেষণা অভিসন্দর্ভ। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে কোথাও উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়নি।

নাসিমা বেগম

অনুমতি পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, নাসিমা বেগম এর এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ *সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা* একটি মৌলিক রচনা। সে আমার তত্ত্বাবধানে তার গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে তার এই অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে (শিক্ষা-সম্বন্ধনীয়) উপস্থাপিত হয় নি।

আমি আরো ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি এই অভিসন্দর্ভটি অনুপুঙ্খ পড়েছি এবং ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবার মতো সন্তোষজনক মনে করছি।

ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা

প্রথমেই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে দীর্ঘ তিন বছর ধরে কাজ করার পর এই অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণা হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হতে যাচ্ছে, এমন একটি মহূর্তে কিছু মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে চাই। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ কে। স্যার এর সহযোগিতা ছাড়া আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজটি সম্পন্ন হতো না। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগে তিনি বিভিন্নভাবে আমাকে সহয়তা করেছেন, এছাড়াও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমার প্রয়োজন অনুসারে গ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এবং যত্ন সহকারে আমার অভিসন্দর্ভটি দেখে ভুলত্রুটি সংশোধন করে নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া আমার বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান স্যার প্রশাসনিকভাবে নানা সময়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমফিল প্রথম পর্বে কোর্স শিক্ষক জনাব গুলশান আরা বেগম ম্যাডাম ক্লাস চলা কালে নানা ভাবে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের উভয়কেই জানাই আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি যাদের তারা হলেন সমর মাইকেল সরেন ও আমার অগ্রজসম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক সুবর্ণা সরকার ও শাহীনুর নার্গিস। যাদের ছাড়া প্রত্যন্ত সাঁওতালি গ্রামে গিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা আমার জন্য দূরহ ব্যাপার হত। এছাড়া এই তালিকায় আরো রয়েছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ, যারা তাদের আতিথেয়তা ও ভালোবাসার বন্ধনে আমাকে কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা বৃত্তি আমার মাঠ-পর্যায়ের কাজকে করেছে অনুপ্রাণিত ও গতিশীল। আমার কাজের প্রথম স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তাদের (কর্তৃপক্ষ) কাছে জানাই আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে আমি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহার করেছি। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার , আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, নবাব ফয়জুন্নসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস-ঢা.বি গ্রন্থাগার, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (আরডিসি) গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি ও অনলাইন উৎস ব্যবহার করেছি। তাই গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও জানাই আমার বিশেষ ধন্যবাদ। সর্বশেষ আমার বাবা, মা ও ভাইদের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও আমাকে আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য।

নাসিমা বেগম
এম.ফিল গবেষক (ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সার-সংক্ষেপ

সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সমতলের একটি উল্লেখযোগ্য আদিবাসী বা ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী। বাংলাদেশে বসবাসরত সাঁওতালদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। তাদের ভাষার নাম সাঁওতালি ভাষা। সাঁওতালদের ভাষা উপমহাদেশের প্রাচীনতম ভাষাগুলোর একটি। এই ভাষার ভাষী বাংলাদেশসহ ভারত ও নেপালে বসবাস করে। বাংলাদেশে সাঁওতালদের আগমন ঘটে ঔপনেবেশিক আমলেই, বিশেষত পেশাগত কারণে, সেই থেকেই তারা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বসবাস করে আসছেন। সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশে সাঁওতাল সংখ্যা দুই লক্ষাধিক (২০১১)। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা অনেকবেশি।

সময়ের হাত ধরে মাটির ঘরে বসবাসরত প্রকৃতি পূজারি সাঁওতালদের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় নানা পরির্তন ঘটেছে। জীবনের তাগিদে প্রাচীন পরিচয় ছেড়ে তাদের বেশিরভাগই মিশে গেছে বাংলাদেশের মাটি আর মানুষের মাঝে। সাঁওতালি সংস্কৃতির অনেক কিছুই যেমন আমরা বাঙালিদের মধ্যে পাই। তেমনি করে সাঁওতালিদেরও যাপিত জীবনে আজ বাঙালি সমাজব্যবস্থার অনেক বিষয়ই দৃশ্যমান। এই পরিবর্তনে দেখা গেছে সাঁওতালদের ভাষাতেও। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ায় মাতৃভাষা ছাড়াও সাঁওতালিদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অনিবার্যভাবেই বাংলা ভাষা জানতে হয়। কিন্তু বাংলাভাষা তারা কীভাবে শিখছে, তা তাদের জীবনে বা ভাষিক পরিবেশে কতখানি প্রভাব যুক্ত বা মুক্ত তা নির্ণয় করা প্রয়োজন তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই। এক্ষেত্রে তাদের ভাষা শিখন হচ্ছে না অর্জন তাও আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরা জানি বিদ্যালয়ে যেসব আদিবাসী ভাষা ভাষী শিশুরা যায় তাদের প্রত্যেকেরই দ্বিতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা কী পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তা আমাদের জানা দরকার, ভবিষত্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে। আবার সাঁওতাল সমাজে অনেক সময়ই দেখা যায় সাঁওতালরা নিজেরাই বাতিল করে দিচ্ছেন মাতৃভাষার ব্যবহারকে। এ ক্ষেত্রে তাদের সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সক্রিয় কিংবা এর সঠিক কারণ কখনো তাদের মনো-সামাজিক দৃষ্টি থেকে অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি। সেসব বিষয় জানার লক্ষ্যেই এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব সাঁওতালদের ভাষার প্রকৃত অবস্থান, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের মধ্য বাংলা ভাষার অবস্থান পাশাপাশি এ বিষয় সংশ্লিষ্ট শিশু, অভিভাবকদের মনোভাব এবং সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে প্রেষণা ও তাদের অর্জিত দ্বিতীয় ভাষার সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা		i
সারাংশ		ii
সূচি		iii-vi

অধ্যায়	বিষয়	
প্রথম	**গবেষণার প্রেক্ষাপট**	**১ - ৬**
	ভূমিকা	
	গবেষণার যৌক্তিকতা	
	উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব	
	সমস্যা চিহ্নায়ন	
	গবেষণা প্রশ্ন	
	গবেষণা পরিধি	
	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	
	গবেষণার বিন্যাস	
দ্বিতীয়	**সাহিত্য পর্যালোচনা**	**৭ - ১১**

তৃতীয়	**গবেষণা পদ্ধতি**	**১২ – ২৫**
	গবেষণার ধাপ	
	উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া	
	সমগ্রক	
	গবেষণা এলাকা	
	গবেষণা সহকারি	
	নমুনায়ন	
	নমুনা সংখ্যা ও প্রশ্নমালা	
	গবেষণা উপকরণ	
	উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	
	নিবিড় দলগত আলোচনা	
	উপাত্ত রক্ষণাবেক্ষণ	
	নীতিগত বিবেচনা	
	উপাত্ত বিশ্লেষণ	
	উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল	
	বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা	
	গবেষণা নকশা	
চতুর্থ	**বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সাঁওতাল**	**২৬ - ৩৮**
	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান	
	বাংলাদেশের আদিবাসী	
	সাঁওতাল জনগোষ্ঠী	
	নামকরণ	
	সাঁওতালদের দৈহিক গঠন	
	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়	
	ধর্ম	
	উৎসব	
	পরিবার ও সামাজিক সংগঠন	
	সাঁওতাল বিদ্রোহ ও বাংলাদেশে আগমন	

পঞ্চম **সাঁওতালি ভাষা** ৩৯ - ৪৮

ভাষাপরিবার
উপভাষা
সাঁওতালি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
লিখনরীতি
সাঁওতালি সাহিত্য
বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষার ভাষিক অবস্থান

ষষ্ঠ **দ্বিতীয় ভাষা অর্জন ও সামাজিক প্রতিবেশ** ৪৯ - ৬৭

দ্বিতীয় ভাষা অর্জন ও শিখন
দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের প্রভাবক
দ্বিতীয় ভাষা শিখন পদ্ধতি
দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের তত্ত্ব
ভাষা অর্জনের স্তর
বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষীর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা

সপ্তম **সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: উপাত্ত বিশ্লেষণ** ৬৮- ৯০

সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
কেস স্টাডি-১
কেস স্টাডি-২

অষ্টম **তথ্য উপস্থাপন ও পর্যালোচনা** ৯১ - ৯৭

গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল
সামাজিক প্রভাবকসমূহ
মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও সাঁওতালি ভাষার সম্ভাব্যতা
দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা
দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ও মাতৃভাষা হিসেবে সাঁওতালি ভাষার গুরুত্ব

নবম **সুপারিশসমূহ, সম্ভাব্য গবেষণা ক্ষেত্র এবং উপসংহার** **৯৮ - ১০৩**

সুপারিশসমূহ
সম্ভাব্য গবেষণা ক্ষেত্র
উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি ১০৪ - ১০৮

পরিশিষ্ট – ১ ও ২

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার প্রেক্ষাপট

ভূমিকা (Introduction)

'*সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা*' শীর্ষক গবেষণাটির মূল বিষয় বাংলাদেশের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এবং তাদের শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা শেখার প্রসঙ্গ। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও আরো অনেকগুলো জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা সরকারি ভাষায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অন্যদের কাছে আদিবাসী নামে পরিচিত। আদিবাসী এসব জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার সাথে এসব ভাষার পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যদিকে বাংলা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় আদিবাসী এসব জনগোষ্ঠীকে মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও জানতে হয় অর্থাৎ শিখতে বাধ্য। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও বাংলা ভাষাই এদেশে প্রধান (কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজীর ব্যবহার রয়েছে)। ফলে এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো অধিকাংশ সময়ই তাদের মাতৃভাষার ব্যবহার নিয়ে বিভ্রান্ত থাকে। সাধারণ যোগাযোগের জন্য তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্য আরেকটি ভাষা শিখতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষাটি হয় বাংলা। তবে বাংলা ছাড়াও অনেক সময় পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার কারণে তাদেরকে অন্য ভাষাও শিখতে হয়। বাংলাদেশে তাই প্রায় ৪৫টি (আদিবাসী ফোরাম, ২০০৭) আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা শিখনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of study)

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত মাতৃভাষা হচ্ছে সাঁওতালি ভাষা। সাঁওতালি ভাষা একটি আস্টোএশীয় ভাষাপরিবারভুক্ত ভাষা। এছাড়া ভিয়েতনামি ও খেমার ভাষার সঙ্গেও এর দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। তবে মুন্ডারি, হো, কুড়ুক, সাভারা প্রভৃতি ভাষার সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন সুবোধ ঘোষসহ (ঘোষ, ২০০০) প্রমুখ গবেষক। এ সুশৃঙ্খল ভাষাটি গবেষণার বিষয় হিসেবেও আমাদের কাছে কৌতূহল উদ্দীপক। এটি একটি প্রাচীন ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষা নিয়ে বিশেষ করে এই ভাষার ভাষীদের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা বা অর্জন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

পৃথিবীতে অনেক জাতিরই মাতৃভাষার পাশাপাশি একটি দ্বিতীয় ভাষা রয়েছে, যা দ্বারা অন্য ভাষার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়। এ দেশের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সহ-অবস্থান ও দৈনন্দিন কর্ম পরিচালনার

জন্য বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহন করতে হয়। বলা যায় তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে একরকম বাধ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে কিয়দাংশ সাঁওতালদের দ্বিতীয় ভাষা হলো বাংলা। অবশ্য অনেক সাঁওতাল বহুভাষীও। তাঁরা সাঁওতালি ও বাংলা ছাড়াও সাদরি ভাষা জানে, কেউ কেউ ইংরেজি জানে। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের জন্য একটি সাঁওতালি শিশু যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে তা অনুসন্ধান করার জন্যেই 'সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সমস্যা' শীর্ষক গবেষণা ও অভিসন্দর্ভ রচনার অন্যতম যৌক্তিকতা।

উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব (Objective and Importance)

দ্বিতীয় ভাষাশিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে সর্বত্র স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষের চিন্তার প্রকাশ ও যোগাযোগের পরিমণ্ডল বিস্তৃত করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সময় ও প্রয়োজন বিবেচনায় একেকটি ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বিশেষ মর্যাদায় আসীন হয়। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বাস্তবতায় বাংলা তাই আদিবাসীদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বিবেচ্য। সে দিক থেকে আমাদের বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শ্রেণিকক্ষে ও পরিবার বা নিজস্ব গোত্রের বাইরেও একজন মানুষের পক্ষে পরিবেশ থেকে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করা সম্ভব (হক, ২০০৭)। আদিবাসী এসব সম্প্রদায়ের শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেই অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বেই অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ থেকে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করে। ফলে সামাজিকভাবে অর্জিত দ্বিতীয় ভাষা শ্রেণিকক্ষের শিখন নয়। এই অর্জনের বিষয়টি প্রথম ভাষা অর্জনের মতোই ধারানুক্রমিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই হয়। বিশেষত এই গবেষণার মূল লক্ষ্য যেখানে শিশু। তাদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের দক্ষতা ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করণই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের অন্যতম আদিবাসী সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা শিক্ষা নিয়ে ইতোপূর্বে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সমাজভাষাতাত্ত্বিক বাস্তবতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বর্তমান গবেষণা কর্মটির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

১) সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের দক্ষতা সম্পর্কে জানা

২) সমাজভাষাতাত্ত্বিক বাস্তবতায় সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নতকরণ

৩) দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা নির্ণয়

সমস্যা চিহ্নায়ণ (Statement of the Problem)

'সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' গবেষণাটির সমস্যা চিহ্নায়ণের ক্ষেত্রে প্রথমেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চিত্রটি উঠে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশে একটি বাঙালি শিশুর তুলনায় একটি আদিবাসী বা ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর শিশু অধিক সুবিধা বঞ্চিত। বঞ্চনার এ দিকটি শুধু সামাজিকভাবেই নয় ভাষাগত দিক থেকেও প্রবল। সামাজিক যোগাযোগের নিমিত্তে দ্বিতীয় ভাষা শিখন বা আয়ত্তীকরণ তাঁর কাছে একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই অর্জন সব সময় স্বাভাবিক হয়না। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় পাঠ্যক্রম না থাকায় ৫ থেকে ৬ বছরের একটি শিশুকেও অনেক সময় ভাষা প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। নিজস্ব পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষীদের সাথে যোগাযোগ কম থাকায় তারা নিম্ন শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা শেখে। একজন আদিবাসী শিশুর সামাজিক বাস্তবতায় এর প্রভাব কেমন এবং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের বিষয়টি কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়ায় সমস্যা চিহ্নতকরণ উপরিল্লিখিত বিষয়গুলোই উঠে এসেছে।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Question)

সমাজভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় একাধিক প্রশ্ন থাকতে পারে। আমাদের বর্তমান গবেষণাটি যেমন একটি সামাজ ও ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, তেমনি তথ্যদাতা হিসেবেও এখানে নানা বয়স ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের। পর্যবেক্ষন ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে আমরা আমাদের গবেষণার প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। নিম্নে প্রশ্নগুলো উল্লেখ করা হল-

ক) গবেষণার প্রধান প্রশ্ন

সাঁওতালি শিশুর ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত কীভাবে সক্রিয়?

খ) গবেষণার সহায়ক প্রশ্ন

সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের সম্পর্ক কী?

গবেষণার পরিধি (Scope of Study)

বিষয় হিসেবে সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বৃহৎভাবে উপস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসী শিশুরই যখন এ ধরনের প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় ভাষা অর্জন হয়। তবে বর্তমান গবেষণায় আমরা দেশের সমগ্র আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন নয় বরং একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের বিষয়টি উপস্থাপন করেছি। এর প্রধান কারণ ছিল সময় স্বল্পতা এবং বিষয়বস্তুর বিশালতা। ফলে আমরা তা না করে একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ও জটিলতাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গবেষণা ফল হিসেবে যে তথ্য এই গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে তা ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাগুলোকেও উপস্থাপন করবে। পাশাপাশি সামাজিক দিক থেকে ভাষা অর্জনে তাদের আগ্রহ ও অনাগ্রহের দিকটিও আমরা জানতে পারব। এ গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিদ্যালয়গামী শিশুদের ভাষিক মনোভাব জানা এবং তাদের শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে জানা। এতে করে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে একজন আদিবাসী শিশুর প্রকৃত সমস্যাগুলো চিহ্নতকরণের মাধ্যমে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকও ভবিষ্যতে তাঁর অগ্রগতি মুল্যায়ন করে তাকে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সহায়তা করতে পারবেন।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study)

প্রতিটি গবেষণারই নানা দূর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা থাকে। সে বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটির কিছু সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করা যায়। এগুলো হল-

ক) তথ্য সংগ্রহে আমরা কেবল রাজশাহী বিভাগকে প্রাধাণ্য দিয়েছি। রংপুর বিভাগের বৃহত্তম সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে যে অল্পসংখ্যক সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করছে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

খ) গবেষণায় মোট ২০টি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। আরো বেশি উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হত।

গ) বাংলাদেশের আদিবাসী সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখনো অজ্ঞাত, সেক্ষেত্রে ভাষাগত তথ্যেরও অপ্রতুলতা রয়েছে। বিশেষত ভাষা শিখন ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রভাবগুলো নিয়ে। এই গবেষণায় তাই সাঁওতালি ভাষা বিষয়ক খুব বেশি সাহিত্য পর্যালোচনার সুযোগ ছিল না।

ঘ) কাজটি আরো বৃহৎ অবয়বে সম্পাদিত হতে পারত, বিশেষত দ্বিতীয় ভাষার ধ্বনি ও শব্দভাণ্ডারের একটি বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহের মাধ্যমে শিশুর ভাষা অর্জনের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা যেত।

ঙ) সময় স্বল্পতা এই গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

গবেষণার বিন্যাস (Organization of the Paper)

বিষয় বিবেচনায় বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে মোট ৯টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে তাঁর একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা রয়েছে। এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি অর্থাৎ কীভাবে গবেষণাটি সম্পাদিত হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। বাংলাদেশের যে বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ এবং আমাদের গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর পরিচয় জানা যাবে চতুর্থ অধ্যায়ে। আমাদের বর্তমান গবেষণাটি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় ভাষা হলেও তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি সম্পর্কে অর্থাৎ এই ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো জানা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে সাঁওতালি ভাষার পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে সামাজিক প্রতিবেশে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের বিষয়টি। মাঠ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: উপাত্ত বিশ্লেষণ। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল আলোচিত হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। সর্বশেষ নবম অধ্যায়ে মূল গবেষণা ফল বিশ্লেষণ করে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া সংযুক্তি হিসেবে রয়েছে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলীয় বর্ণমালা, শব্দ সংক্ষেপণ ও গ্রন্থপঞ্জি। পরিশিষ্ট হিসেবে রয়েছে প্রশ্নমালা, উপাত্ত নমুনা, তথ্যদাতাদের পরিচয়।

এই গবেষণার সুদুরপ্রসারী ফল হিসেবে আমরা জানতে পারব এদেশের আদিবাসীদের ভাষা বিশেষ করে সাঁওতালি জনগোষ্ঠী ভাষা প্রয়োগে সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গসমূহ। অর্থাৎ সমাজে ভাষা প্রয়োগ, অবস্থান, অর্জনসহ বিভিন্ন সমস্যাগুলো। এবং দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে তাদের সামাজিক প্রেষণা, শব্দচয়ন, ভাষা প্রয়োগের ধরণ ও ক্ষেত্র সম্পর্কে। বাংলাদেশে অনেকগুলো আদিবাসী জনগোষ্ঠী থাকলেও বিষয় হিসেবে আমরা কেবল একটি জনগোষ্ঠীর (সাঁওতাল) শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনকে গ্রহণ করেছি। তবে সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের সাথে অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাদৃশ্য থাকলেও তা একীভূত করা হয়তো সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

১. আলী, এম. হাসান। (২০১৩)। *সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান।* ঢাকা: অনু প্রকাশনী।

২. ঘোষ, সুবোধ। (২০০০)। *ভারতের আদিবাসী।* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০৭)। *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন প্রাথমিক ধারণা।* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৪. হাসান, রাগিব। (২০১৫)। *গবেষণায় হাতেখড়ি।* ঢাকা: আদর্শ।

৫. মুসা, মনসুর। (২০০০)। *প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা।* ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা:) লিমিটেড।

৬. শ' রামেশ্বর। (২০০৩)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

৭. নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ।* কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ।

৮. Krashen, Sthephen. (2013). *Second Language Acquisition Theory, Application and Conjectures*. UK: Cambridge university press.

৯. Yule, George. 2010. *The study of language*. Uk: Cambridge university press.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণা পদ্ধতিই একটি অংশ। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভে এই আলোচনা করার গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করি। সাধারণত সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে বোঝায় একটি গবেষণা অভিসন্ধর্ভের এমন অংশ বা গবেষণাটি সম্পর্কিত এমন সাম্প্রতিক তথ্য যা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছে। উৎস বিবেচনায় সাহিত্য পর্যালোচনা দ্বৈতীয়িক উৎস।

Dena Taylor মনে করেন,

> 'A literature review is an account of what has been published on a topic by accredited scholars and researchers... In writing the literature review, your purpose is to convey to your reader what knowledge and ideas have been established on a topic, and what their strengths and weaknesses are (Amanda, 2008).'

জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি সাহিত্য পর্যালোচনা মূলত দুটি দিক কে গুরুত্ব দেয়।

১) তথ্য অনুসন্ধানের দক্ষতা তৈরি করে, বিশেষ করে একটি গবেষণায় কোন তথ্যগুলো ব্যবহার উপযোগী তা বিবেচনার কৌশল নির্ধারণ করা।

২) নিরপেক্ষ ও বৈধ তথ্য গ্রহনের জন্য গবেষকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির (Critical Appraisal) প্রয়োগে সহয়তা করে।

বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনে আমরা বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করেছি। আমাদের গবেষণার প্রাথমিক উৎস ছিল মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত। দৈতীয়িক উৎস হিসেবে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা, ওয়েব অনুসন্ধান করেছি। তার ভিত্তিতেই বর্তমান অধ্যায়টি লিখিত হয়েছে।

বাংলাদেশ একসময় অখন্ড ভারতবর্ষর অংশ ছিল এবং এদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসীদের বসতি ছিল। আদিবাসী সাঁওতালদের ভাষা অর্জন বিষয়ক এই গবেষণায় তাই তাদের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার জন্য আমাদের কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়। বিশেষ করে সুবোধ ঘোষ এর 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থটি বাংলার জনগণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। গ্রন্থটির রচয়িতা গ্রন্থটিতে ভারতের আদিবাসীদের পাশাপাশি, তাদের ধর্ম, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় সংগ্রামে অবস্থান, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা, শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থা সর্বপরি বাংলার আদিবাসীদের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায় বাংলাদেশের আদিবাসী ও

সাঁওতাল অধ্যায়ের বাংলাদেশের পরিচয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের ‘বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)’ গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলার আদি অধিবাসী হিসেবে অনার্য কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি অনার্য জাতিকে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এদের অস্ট্রিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে বাংলাদেশের নামকরণ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য এতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে প্রাচীন এসব অধিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নেই। এ সম্পর্কিত মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য রচিত ‘বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৭৭)’ গ্রন্থে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগ, বাংলাদেশের মুসলমান শাসন, আধুনিক যুগ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাংলাপিডিয়া অনলাইন, শিক্ষক ডটকম, এথনোলগ প্রভৃতি ওয়েব সাইটে সংক্ষেপে বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির উত্থান সপর্কিত সমৃদ্ধ তথ্যাদি সন্নিবেশিত রয়েছে।

বাংলাদেশে সাঁওতালি জাতি এবং তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য পাঠে সহায়ক হয়েছে বেশ কিছু গ্রন্থ। তবে অধিকাংশ গ্রন্থেই একই তথ্যাদির সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রটিতে সবচেয়ে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় তা হল আদিবাসী সংখ্যা নিয়ে। এদেশে সাঁওতালদের সংখ্যা নির্দেশেও এই তারতম্য পরিলিক্ষিত হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে বহুভাষিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত বা বর্তমান বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেমন অবস্থায় রয়েছে তার একটি ধারণা পাই। এই গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপিত হয়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ উপস্থাপনে এই গ্রন্থগুলোর সহযোগিতা গ্রহন করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও সাঁওতালদের পরিচয় বিষয়ক আরো বেশ কিছু গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। তবে এই গ্রন্থগুলো থেকে মৌলিক তথ্য তেমন একটা পাওয়া যায় না। পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্যগুলোই এখানে নানা ভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সুপ্রকাশ রায় রচিত সাঁওতাল বিদ্রোহ গ্রন্থটি সাঁওতাল জাতির ইতিহাস ও বিদ্রোহের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ এবং ১৯৩২ সালে উত্তর বঙ্গের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বিধৃত হয়েছে। মেজবাহ কামাল সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের আদিবাসী জীবনসংগ্রাম ও মানবাধিকার’ গ্রন্থে মূলত বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকার, পরিচয়, ভূমি অধিকার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ‘Santal Community in Bangladesh Problems and Prospects’ গ্রন্থটি রচনা করেছেন Mesbah Kamal, Muhammad Samad, Nilufar Banu. গ্রন্থটির মূল আলোচনা আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দিক নিয়ে। V. Manuel Raj রচিত ‘A Santal Theology of Liberation’ গ্রন্থে ভারতে সাঁওতালদের পরিচয় ও তাদের জীবন-যাপন বর্ণিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে

প্রাসঙ্গিক হলেও এই গবেষণার জন্য আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। বাংলাদেশের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিয়ে রচিত আরেকটি গ্রন্থ 'Santals of Bangladesh'। এই গ্রন্থের রচিয়িতা Ahsan Ali। বাংলাদেশের সাঁওতালদের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। বিশেষত তাদের পরিচয়, সামাজিক জীবন, এদেশে তাদের বসতি স্থাপন, ধর্ম ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন লেখক।

সাঁওতালদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাদের ভাষার বিষয়টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও সাঁওতাল বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেই ভাষা বিষয়ক তেমন কোন আলোচনা নেই। থাকলেও তা অপূর্ণাঙ্গ আলোচনা। সাঁওতালি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থের জন্য তাই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে উপনেবেশিক আমলের মিশনারি গবেষকদের লেখার ওপর। বিশেষ করে স্কেফস্রুড (A grammar of the Santhal Language), বোডিং (A Santal Dictionary) এর গ্রন্থগুলো এক্ষেত্রে মৌলিক। তবে তা সাঁওতালি ভাষার কাঠামো অর্থাৎ ব্যাকরণ ভিত্তিক। পরবর্তীতে তাদেরই পথ অনুসরণ করে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন 'লিঙ্গুস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' এর চতুর্থ খণ্ডতে সাঁওতালি ভাষার একটি তুলনামুলক বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি সাঁওতালি ভাষার পরিবার নির্ধারণ সাপেক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। এছাড়া সাঁওতালি ভাষার ব্যাকরণিক দিকটি ওপর আলোকপাত করেছেন। যা আমাদের বর্তমান গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষার আলাদা বিভাগ থাকলেও সাঁওতালি ভাষার তথ্যানুসন্ধানে আমাদের সে পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি (বিশ্বভারতী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)। বাংলাদেশে গবেষকদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা বিষয়ে আলোচনা করেছেন সৌরভ সিকদার, তার 'বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে মোট ১০টি আদিবাসী ভাষার বিবর্তন ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যার মধ্যে সাঁওতালি ভাষার আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সমাজভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা হওয়ার কারণে ভাষা ও সমাজ এই দুটি বিষয় এখানে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তবে এক্ষেত্রে একক বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ খুব বেশি বিদ্যমান নয়। সেক্ষেত্রে দুটি বিষয় সমন্বিত একটি সাহিত্য পর্যালোচনা এই গবেষণায় অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা সম্পর্কে তথ্য গ্রহনে কিছু বাংলা, ইংরেজি গ্রন্থ এবং ওয়েব সাইটের সহায়তা নেয়া হয়েছে। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে মৃণাল নাথের 'ভাষা ও সমাজ (১৯৯৯)' গ্রন্থটি। এতে পৃথকভাবে সমাজ-ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন প্রপঞ্চ আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে বয়স, দ্বিভাষিকতা, ভাষা মৃত্যু বিভিন্ন প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কিত গ্রন্থ অপ্রতুল। এক্ষেত্রে মহাম্মদ দানীউল হকের 'ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন প্রাথমিক ধারণা (২০০৭)' বাংলাদেশে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় ভাষা অর্জন সম্পর্কিত মৌলিক একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ভাষা অর্জন বিভিন্ন

ভাষাবিজ্ঞানীর তত্ত্বের সমন্বয় করা হয়েছে। তবে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে চমস্কির ভাষা অর্জন তত্ত্বের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। তিনি বিশেষত নানা ধরণের মডেল আলোচনা করেছেন। তিনি মানব শিশু মতিষ্ককে Language Acquisition Device বা LAD হিসেবে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে LAD ধারণাটি সম্ভবত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর। এই গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুর দক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তবে অন্য কনো কোনো বিজ্ঞানীদের আলোচনায় আমরা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে বয়স্কদের দক্ষতার কথাও জেনেছি। এছাড়া তার গ্রন্থে ক্রাশেনের তত্ত্বগুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে। ক্রাশেনের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের এই তত্ত্বগুলো মূলত তার গ্রন্থ 'Principle ans Practice in Second Language Acquisition (1982)' এর উপর ভিত্তি করে নেয়া। Stephen Krashen এর এই গ্রন্থটি আমাদের গবেষণায় আমরা ব্যবহার করেছি। ক্রাশেন তার এই গ্রন্থে ৫টি তত্ত্ব দিয়েছেন যা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত। Catherine, j. Doughty and Michael h. edt. (2003). এর 'The Handbook of Second Language Acquisition' গ্রন্থটিও দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কে নানা তথ্যের সরবরাহ করেছে।

মহাম্মদ দানীউল হকের 'ভাষার কথা: ভাষাবিজ্ঞান' গ্রন্থে ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষনে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এছাড়া আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' রামেশ্বর শ' এর 'সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। গ্রন্থ দুটিতে সংক্ষিপ্তভাবে ভাষাবিজ্ঞানের প্রায় সকল অংশই আলোচনা করা হয়েছে।

ভাষার বিপন্নতার সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী David Crystal এর 'Language Death' গ্রন্থটির সাহায্য নেয়া হয়েছে। এতে ভাষার মৃত্যু কী, এবং ভাষা বাচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে একে সম্পৃক্ত করা যায়। ধ্বনিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে IPA (International Phonetic Alphabet) প্রয়োগে জীনাত ইমতিয়াজ আলী এর ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা গ্রন্থটির সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া গবেষণা পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গরূপে জানার জন্য এম.এস.এ আতীকুর রহমানের সমাজ গবেষণা পদ্ধতি(২০০৫), C.R Kothari এর Research methodology and technigues (2004) সহ বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা ওয়েব সাইটগুলোর মধ্যে বাংলা পিডিয়া, শিক্ষক ডট কম এর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া এথনোলগ, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল সাউথ এশিয়া লাইব্রেরি, গ্রন্থ ডটকম ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. Bolderston, Amanda (June 2008). *Writing an Effective Literature Review*. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*. 39 (2): 86–92.doi:10.1016/j.jmir.2008.04.009.

২. *Literature-review* retrieved from http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

যে কোনো গবেষণা কার্য পরিচালনার অন্যতম ভিত্তি গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি। অর্থাৎ মূল গবেষণা কর্মটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে বা হবে তার একটি কাঠামো। একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে তাই গবেষণা পদ্ধতির অনুপুঙ্খ উপস্থাপন থাকা জরুরি। এ অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণাটিতে কি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে বা কোন প্রক্রিয়ায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। মূল অলোচনায় যাবার পূর্বে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষকরা তাদের আলোচনায় গবেষণা বা Research অভিধাটির নানা ধরণের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকেন।

Yogesh Kumar Singh এর মতে,

> ‘ Research is simply the process of arriving as dependable solution to a problem through the planned and systematic collection, analysis and interpretation of data (2006, p.1).’

অর্থাৎ গবেষণা হল একটি পরিকল্পিত ও নিয়ামানুগ পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমস্যা থেকে একটি নির্ভরযোগ্য সমাধানে উপনিত হওয়ার প্রক্রিয়া।

তিনি গবেষণাকে শব্দ অনুসারে বিভক্তি দেখিয়েছেন—

The term Research consists of two words—

Research = Re + Search

Where re means again and again and search means to find out someting. the follwing process is-

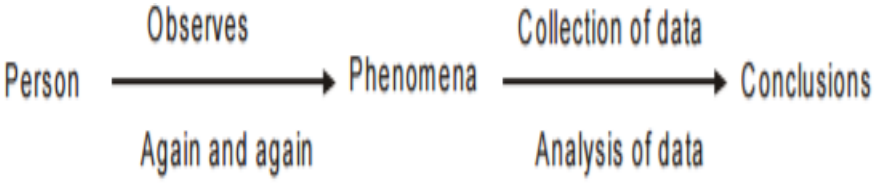

তিনি পুরো প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করেছেন উপরের চিত্রের মাধ্যমে। এখানে একজন অনুসন্ধিচ্ছু ব্যক্তির একাধিক বার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এনে দেয়।

Anol Bhattacherjee বিজ্ঞানকে একটি সংঘবদ্ধ ও নিয়মানুগ জ্ঞান-পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দুটি ধারণাকে সমন্বিত করেছেন -

১। তত্ত্বীয় বা theoretical

২। অভিজ্ঞতালব্ধ বা empirical (2012, p.1- 4)

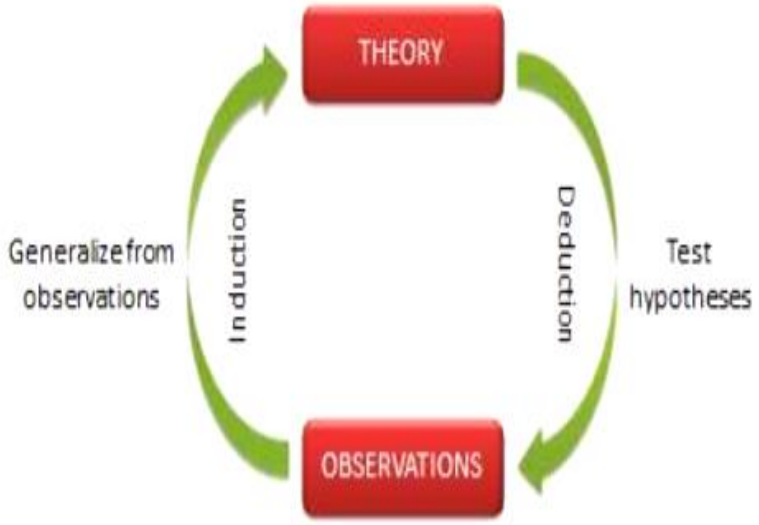

তিনিও তার গবেষণার মডেলে দেখিয়েছেন পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে। তার মতে একটি ঘটনাকে সাধারণীকরণ করে তার একটি ভূমিকায় আসা হয়, এরপর তত্ত্বীয় জ্ঞান প্রয়োগ করে অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

Nicholas walliman গবেষণাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> ‘Research methods are the techniques you use to do research. They represent the tool of trade and provide you with ways to collect, sort and analyze information so that you can come to some conclusions (2011, p.7).’

অর্থাৎ গবেষণা পদ্ধতি হলো এমন কিছু কৌশলের সমষ্টি যা আমরা গবেষণায় ব্যবহার করি। এটি বিশেষ ধরনের উপকরণ উপস্থাপন করে যা তথ্য সংগ্রহের উপায়, তথ্য সজ্জা ও বিশ্লেষণ করে যাতে করে একটি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়।

সুতরাং, একথা বলা যায় যে গবেষণা হল বিজ্ঞানসম্মত একটি উপায় যার মাধ্যমে অজানা বিষয়গুলোকে তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় পাশাপাশি মানবীয় জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা পদ্ধতি প্রধাণত দুই প্রকার-

ক) গুণগত গবেষণা পদ্ধতি

খ) পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি

ক) গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)

গুণগত গবেষণা প্রধাণত অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। গুনগত গবেষণা বলতে বোঝায় এমন এক ধরণের গবেষণা যা গভীর অধ্যায়ন, লক্ষ্যবস্তুর ধরণ, সাধারণ ধারণা ও অনুকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এটি ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ, প্রেষণা এবং মতামত বর্ণনা করে। গুণগত গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি ঘটনার গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করে। এই ধরনের গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হল নিবিড় দলগত আলোচনা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষণ। এই পদ্ধতিতে নমুনা সংখ্যা কম হয় এবং অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা কোটা পূর্ণ করে থাকেন।

খ) সংখ্যাগত গবেষণা (Quantitative Research)

সংখ্যাগত উপাত্তের মাধ্যমে সমস্যা নির্ণয় করে সখ্যাগত গবেষণা পদ্ধতি। উপাত্তগুলো পরিসংখ্যানিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার উপযোগী হয়। গবেষণার এই মাধ্যমটি বৃহৎ সমগ্রকের মনোভাব, মতামত, ব্যবহার নির্ণয় করে। এর উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল গুনগত গবেষণার তুলনায় সুসংগঠিত।

বর্তমানে এই গবেষণার অনেকগুলো রীতি বা ধরণ দেখা যায়, যেমন অনলাইন সার্ভে, পেপার সার্ভে, মোবাইল সার্ভে, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার, ওয়েবসাইট অনুসন্ধান, অনলাইন পোল, নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত সংখ্যা সংক্ষিপ্ত। এটি সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষন হওয়ায় বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় গবেষণাটি গুণগত (Qualitative) পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তবে গবেষণাটির অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপাত্ত বিশ্লেষণে সংখ্যাগত পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমান গবেষণাটিকে কেবল গুণগত পদ্ধতির না বলে গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগে একটি মিশ্র গবেষণা বলা যায়।

গবেষণার ধাপ (Stages of Research)

এই গবেষণাটির মধ্য দিয়ে সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের একটি প্রবণতা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে।

ধাপগুলো হলো –

(১) সাহিত্য পর্যালোচনা

(২) উপাত্ত সংগ্রহ

(৩) উপাত্ত বিশ্লেষণ

১। সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

বর্তমান গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে নানা ধরনের তথ্য সূত্র। বিশেষ করে বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তথ্য এ গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের গবেষণাটি দুটি ভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত করায় এখানে নৃবৈজ্ঞানিক গ্রন্থের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ ও তথ্যভিত্তিক পত্রিকা। এছাড়া গবেষণাটি সুসংবদ্ধভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলোর মধ্যে কিছু দেশি বিদেশি মৌলিক গ্রন্থ, সাঁওতাল আদিবাসী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও সেমিনার পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া মনোভাষাবিজ্ঞানের বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এর থেকে শিশুর দ্বিতীয় ভাষা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান গ্রহন করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্ধর্ভটি রচনারীতি ও মাঠগবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ ও বিভিন্ন এমফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনার বিস্তারিত আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাহিত্য পর্যালোচনায়'।

২। উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Data Collection Process)

যে কোনো গবেষণা কাজে উপাত্ত সংগ্রহ বিশেষ গুরুত্ববহন করে থাকে। একই সঙ্গে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়াও। পূর্ব ধারণা থাকলে উপাত্ত সংগ্রহ কিছুটা সহজ হয়। সাঁওতালিদের বিষয়ে পূর্বে এধরনের গবেষণা হয়নি। আমাদের গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি ছিল একটি আদিবাসী গোষ্ঠী নির্ভর। ফলে উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন ধাপ মেনেই প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সমগ্রক (population)

গবেষণা কাজে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উপাদানের সমষ্টিকে সমগ্রক বা তথ্যবিশ্ব এবং ইংরেজিতে population বলা হয়। যেমন বাংলাদেশের তৈরি পোষাকশিল্পের কর্মিদের বাৎসরিক আয় নির্ণয় করতে দেশের প্রতিটি তৈরি পোষাক কর্মির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সকল তৈরি পোষাক কর্মি এধরনের গবেষণায় সমগ্রক। আমাদের গবেষণাটি যেহেতু বাংলাদেশের সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কিত তাই বাংলাদেশের সকল সাঁওতালি ভাষী শিশু যাদের বয়স ৫ থেকে ১২ বছর, তাদের পিতা মাতা বা অভিভাবক এবং শিক্ষক এই গবেষণায় সমগ্রক হিসেবে বিবেচিত।

গবেষণা এলাকা (Research Area)

সাঁওতাল আদিবাসী বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সমতলে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। স্বভাবতই এদেশে এদের বিস্তৃতিও ব্যাপক। বাংলাদেশের উওত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা-রংপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, দিনাজপুরে এদের সংখ্যা অধিক। এছাড়া পার্বত্য জেলা এবং সিলেট বিভাগের চা বাগানসমূহে কর্মরত কিছু সাঁওতাল দেখা যায়। আমরা আমাদের গবেষণার স্বল্প সময় ও পরিধি বিবেচনা করে মাঠকর্মের জন্য সাঁওতাল অধ্যুষিত বরেন্দ্রভূমি রাজশাহী জেলা নির্বাচন করেছি। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য রাজশাহী সদরের সাঁওতালি পাড়াসমূহ এবং গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁওতাল পল্লীগুলোতে এ গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী জেলার বিভিন্ন সাঁওতালি ভাষা গবেষক, আদিবাসী সংগঠক এবং সাঁওতাল গ্রাম প্রধানের সঙ্গে আমাদের বর্তমান গবেষণা নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা সহকারি (Research Assistant)

গবেষণার মূল লক্ষ্য সাঁওতালি ভাষী জনগোষ্ঠী হওয়ায় মাঠ গবেষণায় তাদের সাথে যোগাযোগ ও উপাত্ত সংগ্রহের সুবিধার জন্য একজন সাঁওতালি ভাষী গবেষণা সহকারীর সহযোগিতা গ্রহন করা হয়েছে। এর ফলে সাঁওতালি ভাষার বিভিন্ন ভাষিক উপাদান সংগ্রহ ও তথ্য প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে সুবিধা হয়েছে।

নমুনায়ন (Sampling)

নমুনা হল সমগ্রকের অংশ বিশেষ। সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী যে অংশ সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শন করতে পারে তাকে নমুনা বলা হয়। একটি আদর্শ নমুনার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল-

ক) আদর্শ নমুনা আকৃতিতে বড় হবে।

খ) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হয়।

গ) আদর্শ নমুনার মনোনয়ন পক্ষপাতহীন হয়।

ঘ) নমুনাগুলোর যথার্থতা বিচার, সম্ভাব্যমূলক বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে।

ঙ) আদর্শ নমুনার গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গবেষণার যথাযথ ফলাফলের সম্ভব্যতা বৃদ্ধি পায় (আলী, ২০১৩)।

নমুনায়ন হচ্ছে নমুনা নির্বাচনের হাতিয়ার। যে পদ্ধতিতে সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয় তাকে নমুনায়ন বা sampling বলে। একটি বৃহৎ সমগ্রক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ সবসময়ই দীর্ঘ সময়, শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেক্ষেত্রে নমুনায়নের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ সবদিক থেকেই সাশ্রয়ী।

আমাদের বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক উৎকৃষ্ট নমুনা গ্রহনের মাধ্যমে মাঠকর্ম সম্পাদন করেছি। কেননা এই গবেষণার সমগ্রক বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদেরকে একীভূত করণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। যদিও উপাত্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নমুনায়নের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে। বিশেষ করে শহরে বসবাসরত সাঁওতালি ও গ্রামে বসবাসরত সাঁওতালি সম্প্রদায়ের প্রদেয় উপাত্তে রয়ে গেছে যথেষ্ট পার্থক্য। আমরা মনে করি উপাত্ত সংগ্রহে আরো বেশ কিছু অঞ্চল থেকে নমুনা গ্রহণ করা হলে ভিন্নতা দেখা যেতে পারে।

নমুনা সংখ্যা ও প্রশ্নমালা (Sample Size and Questionnaire)

গবেষণায় প্রশ্নমালাটি (questionnaire) মোট তিনটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশ সাঁওতালি ভাষী শিশুদের জন্য, দ্বিতীয় অংশটি শিশুর পিতামাতা অর্থাৎ অভিভাবকের জন্য। তৃতীয় অংশটি শিশুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য। অর্থাৎ একেকটি প্রশ্নমালায় তিনজন অংশগ্রহণকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। এখানে মোট ৩৬টি প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নগুলোর ধরণ সমাজভাষাতাত্ত্বিক মনোভাব সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বীয় নানা দিক এই প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিশ্লেষণযোগ্য। আমরা আমাদের গবেষণার জন্য মোট ২০টি উপাত্ত গ্রহণ করেছি। যেখানে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ জন। অর্থাৎ আমাদের মোট নমুনা সংখ্যা ২০টি। এছাড়া শুধু শিশুদের কাছ থেকে একটি ওয়ার্ড শিট বা শব্দ তালিকায় পঞ্চাশটি সাঁওতালি ভাষার বাংলা অনুবাদ সংগ্রহ করা হয়। যার নমুনা সংখ্যাও ২০টি।

গবেষণা উপকরণ (Research Material)

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উপকরণের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রশ্নপত্র, নোটবুক, কলম, পেন্সিল, ভিডিও ক্যামেরা এবং সাঁওতালি ভাষায় লিখিত কিছু পাঠ্যপুস্তক।

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল (Technique of Data Collection)

মাঠ গবেষকেরা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বেশ কিছু কৌশল প্রয়োগ করেন। গবেষণা কৌশল এর উপযুক্ত প্রয়োগ সঠিক উপাত্ত সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে এ ধরনের কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষককে গবেষণার উদ্দেশ্য, নকশা ও লোকবলের দিকটি বিবেচনা করতে হয়। উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে গবেষকরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ করে থাকেন-

ক) পর্যবেক্ষণ

খ) সাক্ষাৎকার

গ) প্রশ্নপত্র

ঘ) সমষ্টিগত বা নিবিড় দলগত আলোচনা

ঙ) প্রক্ষেপণ

চ) নথিপত্র

ছ) অংশগ্রহনমূলক গ্রামীন সমীক্ষা ইত্যাদি

আমাদের বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে আমরা নথিপত্র ব্যবহার ছাড়াও প্রধাণত তিনটি পদ্ধতির ব্যবহার করেছি। নিম্নে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা করা হলো।

১. **পর্যবেক্ষণ** (Observation)

পর্যবেক্ষণ হল এমন একটি উপাত্ত অনুসন্ধান কৌশল যা মুক্তভাবে নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এককথায় দৃশ্যমান ঘটনা বা বিষয়কে সুশৃঙ্খলভাবে নিরীক্ষণ করাই হল পর্যবেক্ষণ। মাঠ গবেষণায় আমরা তাই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সাঁওতাল ভাষী জনগোষ্ঠীকে ভাষাগত ও সামাজগত উভয় দিক থেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে গবেষণায় সাঁওতাল সমাজের কাঠামো ও ভাষাগত অবস্থানের প্রাথমিক ধারণা লাভ করা হয়েছে।

২. **সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি** (Method of Interviewing)

সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত যাবতীয় পদ্ধতির মধ্যে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা উপযোগী। গবেষণার সাক্ষাৎকারকে দুই ব্যক্তির কথোপকথন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমাজ গবেষক এবং উত্তরদাতা মুখোমুখি অবস্থানের মাধ্যমে ঘটনা সমূহের অনুসন্ধান করে থাকেন। বর্তমান গবেষণায় দুই ভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) **কাঠামোগত সাক্ষাৎকার** (Structured Interview)

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গৃহীত সাক্ষাৎকার হল কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার। কেননা এই ধরনের সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আমরা একটি কাঠামোকে অনুসরণ করে তথ্যদাতার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করি। বর্তমান গবেষণার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালায় এধরনের কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন ও উত্তরদাতা ছিল। ফলে এই গবেষণায় নিয়ম মেনে কিছু কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং সঠিক উপায়ে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খ) **কাঠামোবিহীন সাক্ষাৎকার** (Unstructured Interview)

কাঠামোবিহীন সাক্ষাৎকার মূলত কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের বিপরীত। অর্থাৎ এতে কোন প্রশ্নপত্র থাকে না। মাঠ গবেষণায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কাঠামোবিহীন সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছি। বিশেষ করে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের বাইরে সাঁওতালদের ভাষাগত অবস্থা জানার জন্য বিভিন্ন গবেষক, শিক্ষক ও গ্রাম প্রধানের কাঠামোবিহীন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. নিবিড় দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion)

গুণগত গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম নিবিড় দলগত আলোচনা। একজন গবেষকের ভূমিকা এখানে মধ্যস্থতাকারীর। সম-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিরা এখানে অংশগ্রহণ করে নিদির্ষ্ট বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। আমাদের বর্তমান গবেষণার মাঠ কর্মের ক্ষেত্রে আমরা এধরনের একটি নিবিড় দলগত আলোচনা করেছি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাঁওতালি ভাষী শিশু পিতা মাতা, শিক্ষক, গ্রাম-প্রধান, বড় ভাই-বোন ও গ্রামের অন্য সদস্যরা। এই আলোচনা থেকে সাঁওতালি ভাষীর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের বিষয়টি সম্পর্কে সাঁওতালি গ্রামের মানুষদের মতামত এর একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া গেছে।

উপাত্ত রক্ষণাবেক্ষণ (Data Maintanence)

এই গবেষণার অধিকাংশ উপাত্ত লিখিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহকৃত। লিখিত উপাত্তগুলো ফাইল-বদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এবং অডিও ভিজ্যুয়াল উপাত্তগুলো কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

নীতিগত বিবেচনা (Ethical consideration)

যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে নীতিগত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। একজন গবেষক যখন কথা বলা, উপাত্ত সংগ্রহ, চিন্তা এবং একক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন অনেক সময়ই একে নীতি-বিরুদ্ধ বা Unethical Research বলা হয়। কেননা অনেক সময়ই গবেষক নিজের ইচ্ছে মত তথ্য তার গবেষণায় উপস্থাপন করেন। যা গবেষণা ফলাফলকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

যে কোনো গবেষণায় মাঠকর্মের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয় তার বা তাদের অনুমতি নেয়া একটি আবশ্যিক বিষয়। একজন গবেষকের দায়িত্ব যে বিষয়ে তিনি গবেষণা করছেন বা যে বিষয়ে

তথ্য গ্রহণ করা হবে তা আগে থেকেই তথ্যপ্রদানকারীকে জানিয়ে দেয়া। অপরদিকে যিনি তথ্য দিচ্ছেন তারও উচিৎ যথাযথ তথ্য প্রদান করে গবেষককে সাহায্য করা। এর ফলে কোনো রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকে না। গবেষণার সঠিক উদ্দেশ্য ও তথ্য প্রদানে অস্বচ্ছতা থাকলে গবেষণাটি নীতিগত দিক থেকে দূর্বল হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে বর্তমান গবেষণাটি পরিচলনের পূর্বে আমরা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শিশু ও পূর্ণবয়স্কদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাঁওতাল গ্রামপ্রধান, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, শিশুর অভিভাবক ও বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকের অনুমতি গ্রহণ করেছি। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি এই গবেষণাটি নিবিড় দলগত সাক্ষাৎকার, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। যাতে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নিরাপদ বোধ করে এবং অস্বস্তি বোধ না করে।

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় যেন অণুলিপি বা কপি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। বিশেষত প্রতিবেদনটি লেখার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থ ও লেখকের উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে তা তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনটিতে একটি মৌলিক গবেষণা সমস্যা ও তার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩। উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

মূল গবেষণাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপাত্ত বিশ্লেষণ। মূলত এটিই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম সহায়ক। সামাজিক গবেষণায় উপাত্তের বিশ্লেষণ হল এমন মৌলিক ও সৃজনশীল পর্যায় যা গবেষণাকে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্তগুলোকে যথাযথভাবে উপযুক্ত স্থানে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কে স্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। বর্তমান গবেষণায় সংগৃহীত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করার সময় আমরা উপাত্ত বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপ মেনে তা সম্পন্ন করেছি। নিম্নে উপাত্ত বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপগুলো আলোচনা করা হল-

উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল (Strategy of Data Analysis)

সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি কৌশল রয়েছে; এগুলো হল-

ক) গুণগত বিশ্লেষণ কৌশল

খ) সংখ্যাগত বিশ্লেষণ কৌশল

তবে কৌশলগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষককে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে হয়। বিশেষত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া যেন কোন ক্রমেই পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা বাঞ্চনীয়।

আমাদের বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে আমরা গুণাগত ও সংখ্যাগত উভয় বিশ্লেষণ কৌশল অবলম্বন করেছি। গুণাত্মক বিশ্লেষণ হল উপাত্তের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ। ধাপ মেনে আমাদের গবেষণায় প্রথমে উপাত্তের নিরীক্ষণ, উপাত্তের কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ, উপাত্তের সংকোচন, বিন্যাস ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বল্প ক্ষেত্রে উপাত্তের সংখ্যাগত উপস্থাপন করা হয়েছে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত উপস্থাপনে। বিশেষ করে বিভিন্ন গ্রাফ ও চিত্রে এই কৌশলের ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণ শেষে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বৈধতা ও গ্রহনযোগ্যতা (Validity and Expectancy)

গবেষণার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত তথ্যের বৈধতা ও গ্রহনযোগ্যতা থাকা জরুরি। আমাদের বর্তমান গবেষণায় বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতার সাপেক্ষে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও মাঠকর্মের চিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য উৎস হিসেবে প্রতি অধ্যায়ে আলাদা করে গৃহীত উৎসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণা নকশা (Research Design)

একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কার্যের কাঠামোগত বিন্যাসের জন্য গবেষণা নকশা প্রণয়ন অতি জরুরি একটি বিষয়। এটি একটি অপরিহার্য বিষয় কেননা এর মাধ্যমেই গবেষণা যৌক্তিক ভিত্তিভূমি গঠনের পাশাপাশি নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

Fred N. Kerlingger এর মতে,

> "Research design is the plan, structure and strategy of investigation. Conceived so as to obtain answers to research questions and control variance (1983, p. 300)."

অর্থাৎ গবেষণা নকশা হচ্ছে গবেষণা সংক্রান্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর পাবার উপায় এবং চলকসমূহের নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা ও কাঠামো।

C. N. Kothari এর মতে,

> 'The formidable problem that follows the task of defining the Research problem is the preparation of the design of the research project, popularly known as the research design (2004, p31.)'

অর্থাৎ গবেষণা নকশা হল গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তুতি নকশা যা একটি গবেষণা সমস্যাকে সজ্ঞায়িত করার কার্য সম্পন্ন করে।

সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা শীর্ষক গবেষণায় নিম্নরূপ গবেষণা নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি শুরুর দিকে এ সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে গবেষণা অঞ্চল অর্থাৎ কোন অঞ্চলে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করা হবে তা নির্ধারণ করা হয় এবং উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের পর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণাটির ফলাফল বর্তমান প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে এক নজরে বর্তমান গবেষণাটির গবেষণা নকশা চিত্র আকারে উপস্থাপিত হল-

চিত্র: গবেষণা নকশা

গবেষণা একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয়। এসব পদ্ধতির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বের হয়ে আসে কাঙ্খিত গবেষণা ফলাফল। ফলে যে কোনো গবেষণায় নিদির্ষ্ট প্রক্রিয়াগুলো অনুসন্ধান করা খুবই জরুরি। আমাদের বর্তমান গবেষণা একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ তাই এতে গুণগত গবেষণার দিকটি অধিক দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা আমাদের গবেষণাটি যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদিত করেছি এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনেও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. আলী, এম. হাসান। (২০১৩)। *সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান।* ঢাকা: অনু প্রকাশনী।

২. রহমান, এ. এস. এম. আতীকুর। (২০০৫)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি।* ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

৩. তাহের, মো. আবু। (২০০৮)। *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি।* ঢাকা: অনু প্রকাশনী।

৪. হাসান, রাগিব। (২০১৫)। *গবেষণায় হাতেখড়ি।* ঢাকা: আদর্শ।

৫. Aminuzzaman, Salauddin. (1991). *Introduction to Social Research*. Dhaka: Bangladesh Publishers.

৬. Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology Method and Techniques.* New Delhi: New Age International Publishers.

৭. Singh, Yogesh Kumar. (2006). *Fundamental of Research Methodology and Statistics.* New Delhi: New Age International (p) Ltd, Publishers.

৮. Bhattacherjee, Anol. (2012). *Social Science Research: Principles, Methods and Practices*. Textbook Collection, Book.

৯. Retrieved from http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks

১০. Jonker, Jan and Pennink, Bartjan. (2010). *The Essence of Research Methodology*. London: Springer.

১১. Walliman, Nicholas. (2011). *Research methods the basic*. New York: Routledge.

১২. *Qualitative Research*. Retrieved From qualitative research consultants association; retrieved from www. Qrca.org

১৩. *What is the Difference Between Qualitative Research and Quantitative Research* Retrieved from http://www.snapsurveys.com

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সাঁওতাল

রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ আয়তনে একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র হলেও প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশটি বৈচিত্র্যময়। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি বহন করে চলেছে তার ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-উপাদানের উৎস মূলত পৌরাণিক সাহিত্য ও বিভিন্ন শীলালিপি থেকে প্রাপ্ত। প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতি সম্পর্কে নানা বিশেষজ্ঞ মত বিদ্যমান রয়েছে। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বাংলার অঞ্চল নির্দেশ করেন এভাবে,

> 'বর্তমান কালের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোপালপাড়া, বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ এবং ত্রিপুরা বাংলার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় (মজুমদার, ২০১২, ১৯৪৫ পৃ-১)।'

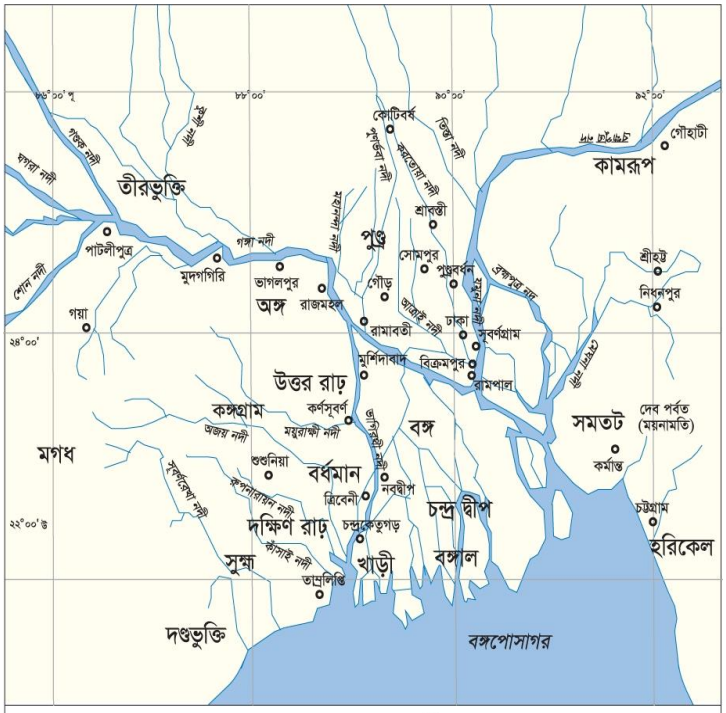

বাংলাদেশ (প্রাচীন যুগ)

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রাচীনকালে বাংলা নামের সমগ্র অঞ্চলটি বেশ কিছু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ছোট ছোট সে সব অঞ্চলকে বলা হয় জনপদ। মজুমদার এর মতে আর্য প্রভাবের পূর্বে বাংলায় কেবল দুটি জাতি অথবা স্থানের কথা জানা যায়, এগুলো হল বঙ্গ ও পুন্ড্র (পৃ-৬; পূর্বোক্ত)। যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত এমন জনপদগুলো হল গৌড়, পুণ্ড, সমতট, সূক্ষ্ম, হরিকেল, দণ্ডভুক্তি ইত্যাদি। বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতাতে (খিস্ট্রপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) ছয়টি জনপদের নাম উল্লেখ করেন এগুলো হল গৌড়, পুণ্ড, বঙ্গ, সমতট,

বর্ধমান এবং তাম্রলিপ্তি। তবে বিভিন্ন ইতিহাস সূত্রে এরকম প্রায় ৮টি জনপদের কথা জানা যায় (প্রাচীন বাংলার জনপদ, ২০১৪)। এসব জনপদের সঠিক অঞ্চল নির্দেশ করা যায়নি, যদিও ইতিহাসবেত্তারা এসম্পর্কে ধারণামূলক অঞ্চল নির্দেশ করে থাকেন। এসব জনপদের তথ্যের মূল উৎস চতুর্থ শতক থেকে বিভিন্ন রাজামলে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্যগ্রন্থ।

অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে বাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত এবং যে অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী বাস করত সে অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠীর নামে পরিচিত হতো (আহমেদ, ২০১৫)। যদিও এর স্বপক্ষে তেমন কোনো দৃঢ় প্রমান পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে বাঙালি অধ্যুষিত এ অঞ্চলটি সর্বপ্রথম বাঙ্গালা নামে পরচিত হয় মুসলিম শাসনামলে। যদিও বঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি অনুসন্ধানে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে ঋগ্বেদের *ঐতরেক আরণ্যক* গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দটির ব্যবহার হয় (চৌধুরী, ২০১৪)। মুঘল ইতিহাসবিদ আবুল ফজল এর মতে বাঙ্গাল শব্দটি বঙ্গ+আল থেকে উৎপত্তি। তিনি জানান বাঙ্গাল সুবাহ এর পূর্ব নাম ছিল বঙ্গ এবং পূর্বের শাসকগণ বিশ গজ প্রস্থ এবং দশ গজ উচ্চতায় উঁচু বাধ বা আল তৈরি করেছেন বলে বঙ্গের সাথে আল শব্দটি যুক্ত হয়ে বঙ্গাল হয়েছে (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭)। তবে এ ব্যাখ্যা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রাচীনকালে এই বাঙ্গাল অঞ্চলে একেকজন রাজা একেকটি জনপদ শাসন করতেন। এরপরে বঙ্গদেশ শাসিত হয় বিভিন্ন রাজশক্তির দ্বারা। এসময় পাল, সেন, গুপ্ত, সুলতানি, মোঘল, বারোভুঁইয়া, নবাবসহ নানা শাসকদের কথা জানা যায়। তবে প্রথম সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮)। মুঘল শাসনামলে সম্রাট আকবরের সময় সমগ্র বঙ্গদেশ সুবহ-ই-বাংলাহ নামে পরিচিত ছিল। এসময় এ অঞ্চলটি বাঙ্গাল নামেও পরিচিত হতে থাকে (রহিম ও অন্যান্য, ১৯৭৭)।

প্রাচীন কাল থেকে বাংলা শাসিত হয়ে আসছে নানা শাসকদের হাতে, প্রাচীন গঙ্গারিডই থেকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের যাত্রা সুদীর্ঘ। মুঘলশাসন-উত্তর ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর বঙ্গ অঞ্চল দাপ্তরিকভাবে বেঙ্গল নামে পরিচিত, এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী পরিচিত হয় বাঙালি নামে। বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রথম বঙ্গ রাজ্যে শাসন প্রতিষ্ঠা করে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালে তা রদ করা হয়।১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয় প্রায় ১৬০০ কিলোমিটারের দুরত্ব থাকার পরও দুটি অঞ্চলে। ধর্ম-জাতি ভিত্তিতে করা এ বিভাজনে বাংলাও দুটি অংশে বিভক্ত হয়, পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলা পাকিস্থানে যুক্ত হয়, পরে ১৯৫৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্থান রাখা হয়। পূর্ব বাংলায় জমিদারি প্রথার বিলোপ হয় ১৯৫০ সালে এবং ভাষা আন্দোলন সংঘঠিত হয় ১৯৫২ সালে। বাংলা ভাষা ১৯৫৬ সালে পাকিস্থানের প্রথম সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার

সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের সুদূর প্রসারী ফলাফল হিসেবে ১৯৬৬ ছয়দফা, ১৯৬৯ এর গণুভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Area of Bangladesh)

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিয়ানমর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫,১৩৮ কিলোমিটার এবং জলসীমা ৭১১ কিলোমিটার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ অনুসারে (২০১৫-১৬ সাময়িক প্রাক্কলন) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫৯,৯ মিলিয়ন। এর মধ্যে পুরুষ মহিলা অনুপাত ১০০.৫ : ১০০ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,০৬৩ জন।

বাংলাদেশের আদিবাসী (Indigenous People of Bangladesh)

প্রাচীন বঙ্গদেশের আদি অধিবাসী কারা ছিল সে সম্পর্কে খুব বিস্তারিত জানা যায় না। প্রামান্য উপাদান না থাকায় অনেক সময় আমাদের অনুমান নির্ভর হতে হয়। সভ্যতার ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় পাথরের তৈরি হাতিয়ারই মানব সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের তৈরী হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে ঐতিহাসিকরা এ অঞ্চলে পাথর যুগের সেই মানব বসতি স্থাপনের সঠিক কালনির্দেশ করতে পারেন নি। দশ হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে এমন মানব বসতি গড়ে উঠেছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন (আহমেদ, ২০১৫)। অনেক বিশেষজ্ঞই মত দিয়েছেন আদি-প্রস্তর যুগের শুরু ২.৫ মিলিয়ন বা ২৫ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় (Violatti, 2014)। সেক্ষেত্রে বাংলায় যে দশ হাজার বছর আগে পাথর যুগের সূচনা হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন তা মূলত নব্য প্রস্তর যুগ।

ভারতে মানব বসতির সময়কাল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অতুল সুর ভারতে নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব নিরূপনে প্রধানত ৩টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলো নিম্নরূপ-

১) প্রাচীনতম মানবের কঙ্গালাস্থি
২) জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক নজির
৩) বর্তমানে দৃষ্ট জাতিগুলোর নৃতত্ত্বমূলক বৈজ্ঞানিক পরিচয়।

তার মতে, বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক, নৃতত্ত্বের ভাষায় আদি-অস্ট্রাল। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে। তিনি এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো জানান একসময় আদি-অস্ট্রাল বা প্রাক-অস্ট্রেলীয় জাতির লোকেরা উত্তর

ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌছায়। তবে সুর এ সম্পর্কে কোনো প্রামান্য দলিল উপস্থাপন করেন নি।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত নিষাদরা এই আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠীভুক্ত বলে তিনি দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো মনে করেন এই মূল জাতির এক শাখা দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মেলেনেশিয়ায় যায় ও সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌছায়। বাংলার আদিম অধিবাসীরা এই গোষ্ঠীর লোক। এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী কোন কোন উপজাতি (সুর, ১৯৭৭)।

তবে এ বিষয়ে সুর এর সঙ্গে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯২) এর তথ্যের কিছুটা বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায়। চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ভারতের আধিবাসীদের মধ্যে নিগ্রো বা নিগ্রোবটু সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। এরা প্রাগৈতিহাসিক কালে আফ্রিকা থেকে আরব, ইরান এবং বেলুচিস্থানের উপকুল ধরে ভারতবর্ষে এসে পৌছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি এদেরকে আদিপ্রস্তর যুগ বা Eolithic যুগের মানুষ মনে করেন।

তার মতে

> ‘নিগ্রো বা নিগ্রোবটুদের পরে প্রাগৈতিহাসিক কালে আর একটি জাতির মানুষ ভারতে আগমন করে, সম্ভবত পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দেশ পালেস্তীন হইতে; ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোটো অস্ট্রোলয়েড অর্থাৎ আদিম অথবা প্রাথমিক দক্ষিণাকার-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মত চেহারা, কিন্তু ঐ জাতির আদি অবস্থায় ছিল ইহারা (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ-৭)।‘

তিনি আরো জানান প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের জনগণ আর্যদের দ্বারা নিষাদ নামে অভিহিত হত। দক্ষিণ বা নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষাকে তিনি ৩ শ্রেণিতে ভাগ করেন।

১। কোল বা মুন্ডাঃ সাঁওতাল, মুন্ডারি, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোরকু, জুয়াং, শবর বা শোরা, পদব
২। খাসি
৩। নিকোবরী (প্রাগুক্ত)।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নির্ভর তথ্য থেকে আমরা বঙ্গ অঞ্চলে যেসব প্রধান জাতির বসবাসের কথা জানতে পাই তারা হল- পুণ্ড্র, শবর, কৈবর্ত, বাগদি, নিষাদ, ডোম, সদগোপ, মল্ল প্রভৃতি। এদের মধ্যে কৈর্বত, শবর, পুণ্ড্ররা আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করতেন। শবররা অরণ্যচারী, কৈর্বতরা কৃষিজীবী ছিল। বাগদিদের বর্তমান বাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলি, নদীয়াসহ বিভিন্ন জেলায়। এরা প্রাচীনকালে রাঢ় অঞ্চলের ভূমিহীন প্রজা ছিল। নিষাদরা অনার্য। ঐতিহাসিকরা কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহালি, ভূমিজদের নিষাদ জাতিভুক্ত করে থাকেন। পশ্চিম ভারত ও মধ্য ভারতের গাঙ্গেয় অঞ্চলে নিষাদ জাতির আদি নিবাস ছিল বলে ধারণা করা হয়। নৃতাত্ত্বিকভাবে এরা আদি অস্ট্রেলীয় এবং অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী (কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২০০৭)।

প্রাচীন মানব অস্থি সন্ধান বিষয়ে সুর তাঁর গ্রন্থে (১৯৭৭) জানিয়াছেন ত্রিশের দশকে আমেরিকান অধ্যাপক ড. এইচ ডি টেরা ভারতের উত্তর পশ্চিম পর্বত মালায় মানবের পূর্ববর্তী পুরুষের অস্থির সন্ধান পান। এগুলো রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস, ব্রাক্ষ্ম পিথেকাস। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই অস্থিগুলো মানুষের নয়। এ অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন মানুষের অস্বিত্ব জানা গেছে ১০,৫০০ বছর আগের অর্থাৎ প্রস্তর যুগের। ১৯৭৮ সালে রাঢ় অন্তর্ভুক্ত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের কাছে সিজুয়ায় এই মানব ফসিলের (দেহ নমুনার) সন্ধান মেলে (কামাল ও অন্যান্য সম্পা, ২০০৭)।

বর্তমানে বাংলাদেশে এখনো কিছু প্রাচীন আদিবাসী রয়ে গেছে নিজেদের ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে। তবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাচীন এসব নৃগোষ্ঠীসহ প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে (সংহতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৮)। সরকারি হিসেবে এদের মোট জনসংখ্যা ১৮ লক্ষ (জনগণনা জরিপ, ২০১১)। কোন কোন গবেষক অবশ্য আদিবাসী সংখ্যার তারতম্য দেখিয়েছেন। তাই কখনো এই সংখ্যা ৭৩ (কামাল ও অন্যান্য, ২০১০) কিংবা ৭৫টিতে (Kamal and Others, 2014) পরিবর্তিত হয়েছে। এই দ্বিধা বিভক্তির প্রধান কারণ বাংলাদেশে আদিবাসী সজ্ঞায়ণ ও চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত সমস্যা। তাই আদিবাসীরা এদেশে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নৃজাতি ও আদিবাসীসহ নানা নামে পরিচিত। পেশাগত পরিচয়ও কখনো কখনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে যুক্ত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত Indigenous and Traibal People Convention, 1989 এর কনভেনশন নং ১৬৯ এর বর্ণিত কোন জনগোষ্ঠীর আদিবাসী হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ করতে পারি।

ক) স্বাধীন দেশসমূহের ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় জনসমষ্টির অন্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা কিংবা ঐতিহ্য অথবা বিশেষ আইন বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ) স্বাধীন দেশসমূহের জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় এই বিবেচনায় যে তারা রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের কালে অথবা বর্তমান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের কালে এই দেশে কিংবা যে ভৌগোলিক ভূখণ্ডে দেশটি অবস্থিত সেখানে বাসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর বংশধর এবং তারা তাদের আইনগত মর্যাদা নির্বিশেষে তাদের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখে (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ২০১২)।

এছাড়া অতুল সুরও আদিবাসীদের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ-

ক) উপজাতি হতে জন্ম
খ) আদিম জীবনযাত্রা প্রণালী
গ) দুরধিগম্য স্থানে বাস
ঘ) অনুন্নত অবস্থা

উপরের বৈশিষ্ট্যনুসারে বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যায়। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অনার্য মানুষেরা (বর্তমানে কোল, ভিল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি) এই দেশের আদি বাসিন্দা হলেও পরে আভিবাসনের মাধ্যমে ভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী মঙ্গোলীয়রা এদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এদেশে আদিবাসীদের সাধারণত দুটি প্রধান অঞ্চলে বাস করে এবং অঞ্চল ভিত্তিতে এদের সমতলের আদিবাসী ও পাহাড়ের আদিবাসী নামে বিভক্ত করা হয়। নিচের ছকে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আদিবাসী, তাদের ভাষা, জনসংখ্যা ও বসতি স্থান দেখানো হল-

ক্রম	ভাষা	ভাষাপরিবার	জাতি	অবস্থান	জনসংখ্যা (২০১১)
১	বাংলা	ইন্দো-ইউরোপীয়	বাঙালি	সমগ্র বাংলাদেশ	১৫ কোটি+
২	চাকমা	ইন্দো-ইউরোপীয়	চাকমা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪৪৪৭৪৮
৩	চাক	চিনা-তিব্বতি	চাক	ঐ	২০০০
৪	বম	চিনা-তিব্বতি	বম	ঐ	১২৪২৪
৫	লুসাই	চিনা-তিব্বতি	লুসাই	ঐ	৯৫৯
৬	মারমা	চিনা-তিব্বতি	মারমা	ঐ	২০২৯৭৪
৭	ম্রো	চিনা-তিব্বতি	ম্রো	ঐ	৩৯০০৪
৮	পাংখোয়া	চিনা-তিব্বতি	পাংখোয়া	ঐ	২২৭৪
৯	রাখাইন	চিনা-তিব্বতি	রাখাইন	ঐ	১৩২৫৪
১০	তঞ্চঙ্গা	ইন্দো-ইউরোপীয়	তঞ্চঙ্গা	ঐ	৪৪২৫৪
১১	ককবরোক	চিনা-তিব্বতি	ত্রিপুরা	ঐ	১৩৩৭৯৮
১২	খিয়াং	চিনা-তিব্বতি	খিয়াং	ঐ	৩৮৯৯
১৩	খুমি	চিনা-তিব্বতি	খুমি	ঐ	৩৩৬৯
১৪	কন্দ	দ্রাবিড়	কন্দ	সিলেট বিভাগ	স্বল্প
১৫	মুন্ডারি	অস্টো এশিয়াটিক	মুন্ডা	উত্তরবঙ্গ ও সাতক্ষীরা জেলা	৩৮২১২
১৬	হাজং	ইন্দো-ইউরোপীয়	হাজং	বৃহত্তর ময়মনসিংহ	৯১৬২
১৭	খাসি	অস্টো এশিয়াটিক	খাসি	সিলেট বিভাগ	১১৬৯৭
১৮	খাড়িয়া	অস্টো এশিয়াটিক	খাড়িয়া	সিলেট বিভাগ	স্বল্প
১৯	কোচ	চিনা-তিব্বতি	কোচ	বৃহত্তর ময়মনসিংহ	১৬৯০৩
২০	কোল	অস্টো এশিয়াটিক	কোল	রাজশাহী বিভাগ	২৮৪৩
২১	মৈতৈ মণিপুরী	চিনা-তিব্বতি	মণিপুরী	সিলেট বিভাগ	২৪৬৯৫

২২	বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী	ইন্দো-ইউরোপীয়		ঐ	মৈতৈসহ একত্রে ২৪৬৯৫
২৩	কুঁড়ুখ	দ্রাবিড়	ওঁরাও	উত্তরবঙ্গ	৩০-৪০হাজার (আনুমানিক)
২৪	মালতো	দ্রাবিড়	পাহাড়িয়া	ঐ	৮০০০
২৫	লালেং	চিনা-তিব্বতি	পাত্র	সিলেট বিভাগ	২০৩৩
২৬	সাঁওতালি	অস্টো এশিয়াটিক	সাঁওতাল	উত্তরবঙ্গ ও রাঙামাটি	১৪৭১১২
২৭	উড়িয়া	ইন্দো-ইউরোপীয়		সিলেট বিভাগ	স্বল্প
২৮	সৌরা	অস্টো এশিয়াটিক	সৌরা	সিলেট বিভাগ	স্বল্প
২৯	কোডা	অস্টো এশিয়াটিক	কোডা	রাজশাহী বিভাগ	স্বল্প
৩০	গারো	চিনা-তিব্বতি	গারো	বৃহত্তর ময়মনসিংহ	৮৪৫৬৫
৩১	উর্দু	ইন্দো-ইউরোপীয়		ঢাকা, নীলফামারী, পাবনা প্রভৃতি	২-৩ লক্ষ প্রায়
৩২	বেদে ঠার	ইন্দো-ইউরোপীয়	বেদে	ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি	১-২ লক্ষ
৩৩	লিঙ্গাম	অস্টো এশিয়াটিক	লিঙ্গাম	বৃহত্তর ময়মনসিংহ	স্বল্প
৩৪	সাদরি	ইন্দো-ইউরোপীয়	রবিদাস	উত্তরবঙ্গ ও সিলেট	১-২ লক্ষ
৩৫	রেংমিটচা	চিনা-তিব্বতি	রেংমিটচা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪০ জন
৩৬	কানপুরি	ইন্দো-ইউরোপীয়	কানপুরি	ঢাকা	স্বল্প
৩৭	অহমিয়া	ইন্দো-ইউরোপীয়	অহমিয়া	পার্বত্য চট্টগ্রাম	স্বল্প
৩৮	গুর্খা বা নেপালি	ইন্দো-ইউরোপীয়	নেপালি	ঐ	স্বল্প
৩৯	মাহলে	অস্টো এশিয়াটিক	মাহলে	উত্তরবঙ্গ	-
৪০	মাদ্রাজি	দ্রাবিড়	মাদ্রাজি	ঢাকা, সিলেট	স্বল্প
৪১	তেলুগু	দ্রাবিড়	তেলুগু	ঢাকা ও উত্তরবঙ্গ	১-২ লক্ষ

ছক: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিচালিত বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' ২০১৬ অনুসারে।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠী (Santal People)

সাঁওতালরা এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে তাদের প্রথা, ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৬২ লক্ষ সাঁওতাল রয়েছে (সূত্র: ভারত বাংলাদেশ জনগণনা জরিপ)। এরা মূলত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশে বাস করে। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরা দ্বিতীয় বৃহত্তম বলা যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর,

গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এদের দেখা যায়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সিলেটের চা বাগানে অল্প কিছু সাঁওতাল বসবাস করে। তবে এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক রংপুর বিভাগে বসবাস করে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ২,০২,৭৪৪ জন। কিন্তু ২০১১ সালের বাংলাদেশের আদমশুমারি হিসেব মতে তাদের জনসংখ্যা দেখানো হয় ১,৪৭,১১২ জন। যদিও সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণ এই সংখ্যা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে এই সংখ্যা আরো বেশি।

সম্প্রতি সমাপ্ত বাংলাদেশের নৃভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশে সাঁওতাল জনসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ বলে জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনুসারে সাঁওতালরা নিষাদ জাতিভুক্ত অনার্য সম্প্রদায়। এদের আদি বাসভূমি ছোট নাগপুরের মালভূমি এবং আসামের পাহাড় ও বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে (কামাল, ২০১০)। অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন সাঁওতালরা উত্তর ভারত থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বসতি গড়েছিল। ভারত থেকে আনুমানিক তিরিশ হাজার বছর আগে এরা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গমন করে (সুর, ১৯৭৭)। পূর্বে ধারণা ছিল প্রায় দশ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া হয়ে ব্রহ্মদেশ ও আসামের ভেতর দিয়ে অস্ট্রোএশীয় জনগোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে গবেষকরা ধারণা দিচ্ছেন ভারতের ঝাড়খণ্ডের এ অঞ্চল থেকেই সাঁওতালরা অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে গমন করে। এরা প্রাচীনকাল থেকে হাজারিবাগ, মালভুম (চায়চাম্পা) এবং বিহার সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করতো। ধারণা করা হয় আর্যদের আগমনের পূর্বেই এ অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব ছিল। মোঘল আমলে সাঁওতালরা বিতাড়িত হয়ে হাজারিবাগ মালভূমের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছেড়ে সাঁওতাল পরগণা ও নিকটস্থ জঙ্গলে আবাস গড়ে তোলে (সিকদার, ২০১১)।

নামকরণ (Naming)

সাঁওতাল একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জাতি হওয়ায় নানা সময়ে এরা নানা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। সাঁওতাল ছাড়া এই নামগুলোর মধ্যে রয়েছে হর, হড়, হোর, হর-রব, সাংদাল, সাংতাল, সনথাল, সাতার, সাঁওতাল প্রভৃতি।

সাঁওতালরা নিজেদের বলে ‘হড়’ যার অর্থ তাদের ভাষায় মানুষ। তাদের ভাষা হলো ‘হোড় বোড়’ অর্থাৎ মানব ভাষা। সাঁওতাল শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও এঁদের মতে প্রকৃত উচ্চারণ হবে সান্তাল। স্কেফস্রুড (Skrefsrud) এর মতে, সাঁওতাল শব্দটি সাওতার নামের অপভ্রংশ। যা তারা মেদিনীপুরের সাওন্ত এর এলাকার কয়েক প্রজন্ম ঘুরে বেড়ানোর মাঝে গ্রহণ করেছিল। সাঁওন্তে যাওয়ার আগে তাদের নাম ছিল খারওয়ার। যা মূল খার শব্দ থেকে হর শব্দটি এসেছে। যার অর্থ মানুষের প্রকারভেদ। তিনি আরও বলেছেন, সাঁওতাল শব্দটির উদ্ভব হয়েছে সুতার (soontar) থেকে। তাঁর মতে, সুতার বাঙালিদের দেয়া নাম।

অনেকে সাঁওতালদেরকে পূর্ব জাতিগত পরিচয় ‘খেরওয়ার’ বলেও অভিহিত করেন। পরবর্তীতে সান্ত নামক স্থানে থাকার কারণে সম্ভবত ইংরেজরা তাদের সাঁওতাল বা সাঁওতাল নামে অভিহিত করে (হাঁসদা, ২০০৯)।

সুরের মতে, কিংবদন্তী অনুযায়ী তাদের পূর্ব নাম খারবার। খর শব্দ থেকেই হর এসেছে। সাঁওতালদের উপকথা অনুসারে তাদের আদি বাসস্থানকে হিরিরি বা অহিরিপিরিতে। অনেকে এই স্থানকে হাজারিবাগ জেলাভুক্ত অহুরি পরগণাকে নির্দেশ করেন (১৯৭৭)।

সাঁওতাল নাম সম্পর্কে গ্রিয়ারসন বলেন,

> 'Santal is the name applied by foreigners to the tribe which has given its name to the sonthal paraganas. Santal is according to Mr. skrefsrud a corruption of saotal or saotar, the common name of the tribe used by Bengalis.' (Grierson, 1904, p. 30)

সাঁওতালরা নিজেদের har ko বা har hapan সম্বোধন করে যার অর্থ মানুষের সন্তান। সে সময় তারা নিজেদের মানঝি (manjhi) নামেও পরিচয় দিত।
ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রিয়ারসন বলেছেন, ভাষাটি হড়, মানঝি, পাহাড়ি, জঙ্গালি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল একসময়। বাকুড়া ও ময়ুরভাঞ্জে ঠার, মুর্শিদাবাদে জংলি, সাঁওতালরা পূর্বে খেওয়ার নামে পরিচিত ছিল।

সাঁওতালদের দৈহিক গঠন (Physical Stracture of Santhali People)

গঠনগত দিক থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিগ্রোবটু নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এ যাবৎ তাদের আদিরূপটি অবিকৃত রয়েছে। এদের উচ্চতা মাঝারি ও খাটো, গাত্রবর্ণ কালো, নাক চওড়া, চুল কোঁকড়া। অস্ট্রিক ভাষী অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন কোল মুন্ডাদের সাথে এদের গঠনগত গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

চিত্র: নৃত্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সাঁওতালি রমনীরা।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় (Social and Cultural Introduction)

সাঁওতালদের পৌরাণিক বিশ্বাস যে সৃষ্টিকর্তা পাখির ডিমের মাধ্যমে পৃথিবীতে এনেছেন। পৃথিবীতে ডিম থেকে জন্ম নেয়া সান্তালদের সেই আদি মানবের নাম পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি তারা থাকত হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে। পিলচু বুড়া ও বুড়ির সাতটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে জন্ম নেয়। তারা সেই সাত ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয়ার মাধ্যমে সান্তালদের ৭টি পদবিতে বিভক্ত করে দেন। নিজস্ব পদবিতে বিবাহ করা সাঁওতাল সমাজে সিদ্ধ নয়। পরে এই সাতটি পদবির সাথে আরো ৫টি পদবি যুক্ত হয়ে সাওতালদের মধ্যে মোট বারোটি পদবি হয়। এই বারোটি পদবি হল-

১) হাসদা	২) মুরমু
৩) কিস্কু	৪) হেম্বরম
৫) মার্ডী	৬) সরেন
৭) টুডু	৮) পাউরিয়া
৯) বেসরা	১০) বাস্কে
১১) চঁড়ে	১২) বেদিয়া

হাসদা সাঁওতাল পৌরাণিক কাহিনির যোগসূত্র ধরে জানান যে, মানুষের বংশ বিস্তার হলে সাঁওতালরা প্রথমে জড়াপি দেশে গমন করে, তবে সে দেশের বর্তমান অবস্থান তিনি উল্লেখ করেন নি। এরপর স্থান ত্যাগ করে আয়রে নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে, এরপর পর্যায়ক্রমে চাম্পা (অনুমিত পাঞ্জাব) এবং দামিন-ই-কো (ঝাড়খণ্ডে) বসতি স্থাপন করে (হাঁসদা, ২০০৯)।

ধর্ম (Religion)

সাঁওতালদের আদি ধর্ম *সারনা*। তবে সাঁওতালদের মধ্যে অনেকে তাদের ধর্মকে *সাঁওতাল ধর্মও* বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অনেক গবেষক তাত্ত্বিকভাবে একে সর্বপ্রাণবাদ বলেছেন (কামাল ও অন্যান্য সম্পা, ২০১০)। যে ধর্মে প্রধান উপাস্য সূর্য বা সিং বোঙ্গা। এছাড়া বড় পাহাড়ের দেবতা বা গ্রামের দেবতা হল মারাং বুরু। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাগুলোতে লৌকিক হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব দেখা যায়। তবে এদের ধর্মাচরণে মূর্তিপূজার প্রচলন নেই। এরা মূলত ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতি উপাসক, আবার তারা 'ঠাকুরজিউ'-কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করে (আহমদ রফিক, ২০১৫)। তবে সাঁওতালদের মধ্যে অনেকে বর্তমানে *খ্রিষ্টধর্ম* পালন করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলে মিশনারিদের আগমন হলে, ধীরে ধীরে সাঁওতালদের অনেকেই আদি ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

উৎসব (Festival)

সাঁওতালদের মধ্যে নানা উৎসব প্রচলিত। ফাল্গুন মাস তাদের বছরের প্রথম মাস। প্রতি ঋতুতেই সাঁওতালদের পরব বা উৎসবের আয়োজন থাকে। তাদের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ফাল্গুনে মাসে স্যালসেই উৎসব, চৈত্রে বোঙ্গাবোঙ্গি, বৈশাখে হোম, আশ্বিনে দিবি, পৌষ শেষে সোহরাই উৎসব পালিত হয়। সোহরাই উৎসব সাঁওতালদের একপ্রকার প্রধান উৎসব যা পৌষ সংক্রান্তির দিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে বাহা অর্থাৎ ফুল-ফোঁটার উৎসব। সাঁওতালদের উৎসবের সাথে মিশে আছে তাদের নৃত্য-গীত ও বাদ্যযন্ত্র। সাঁওতালরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পরিবেশনের মাধ্যমেই এসব উৎসব পালন করে থাকে।

পরিবার ও সামাজিক সংগঠন (Family and Social Organization)

সাঁওতাল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। মেয়েরা কাজে-কর্মে পরিবারে প্রায় সমান অবদান রাখলেও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা নেই। মেয়েদেরকে সাধারণত পৈতৃক সম্পদের ভাগ দেয়া হয় না। এখনো সাঁওতালদের মধ্যে যৌথ ও একক পরিবার উভয়ই দেখা যায়।

গ্রাম পরিচালনায় সাঁওতালদের সনাতনী সামাজিক সংগঠন মাহাঞ্জি কমিটি নামে পরিচিত। সাঁওতাল গ্রামগুলোতে মাহাঞ্জি কমিটির সাত সদস্য থাকে এবং খ্রিস্টান গ্রামগুলোতে ৫ সদস্যের কমিটি থাকে।

ক্রম	সাধারণ সাঁওতাল মাহাঞ্জি কমিটি	খ্রিস্টান সাঁওতাল মাহাঞ্জি কমিটি
১	মাঞ্জহি	মাঞ্জহি
২	পারাণিক	পারাণিক
৩	জগ-মাঞ্জহি	জগ-মাঞ্জহি
৪	জগ পারাণিক	গোডেৎ
৫	নায়কে	গির্জা- মাস্টার
৬	কুডাম-নায়কে	-
৭	গোডেৎ	-

মাঞ্জহি কমিটি মূলত একটি প্রশাসনিক কমিটি। সাঁওতালদের সামাজিক কার্যাবলি যেমন- জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, উৎসব ইত্যাদিতে এই কমিটি নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও বাংলাদেশে আগমন (Santal movement and Migration to Bangladesh)

বাংলাদেশে সাঁওতালদের আগমন সম্পর্কিত কোন তথ্যই স্পষ্ট নয়। গবেষকরা নানা উদ্ধৃতির মাধ্যমে জানান ১৮৯১ সাল বা তারও পূর্ব থেকে পরিত্যক্ত এলাকাগুলো কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করার জন্য ছোট-নাগপুর থেকে বিভিন্ন সময়ে কৃষি শ্রমিক হিসেবে সাঁওতালদের এদেশে আনা হয়। এছাড়া সাঁওতালদের এদেশে আগমনের আরো দুটি কারণ রয়েছে বলে জানা যায়। প্রথমত, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে সাঁওতালদের আদি নিবাস ছোট নাগপুরের জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানো হচ্ছিল, ফলে তারা জঙ্গল ছাড়তে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চীরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি হয়। এসব জমিদার সস্তায় সাঁওতালদের এনে তাদের কৃষি শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করে। ফলে সাঁওতালরা স্থানান্তরিত হয় (কামাল ও অন্যান্য, ২০১০)।

এ প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম হান্টার একটি মতবাদ দেন, যা কিছুটা দ্ব্যর্থবোধক। তিনি উল্লেখ করেন যে, সাঁওতালরা পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গে আসেন এবং অতঃপর পশ্চিম দিকে তাদের বসতি বিস্তার লাভ করে। এ পূর্বাঞ্চল বলতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন অঞ্চল তা আজও জানা যায় নি (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭)। তবে দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস করছিলেন। ১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে নির্বিঘ্ন বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী এলাকা নির্ধারণ করে দেয়। এ এলাকা সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত হয়। কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংকটময় পরিণামের সেখানে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উদ্ভব ঘটে। মহাজনদের অত্যাচার ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছতার প্রেক্ষিতে সাঁওতালরা প্রবল প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ ১৮৫৫ সালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। যা সাঁওতালদের ভাষায় হুল নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহে দশ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের অনেকে সাঁওতাল পরগণায় থাকা নিরাপদ মনে না করায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। পিয়ের বেসাইন্ত উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সাঁওতালদের অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা থেকে এখানে আগমন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. *আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৭) ও আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং ১৬৯)*। (২০১২)। ঢাকা: অন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

২. কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.)। (২০০৭)। *বাংলাদেশের আদিবাসী*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৩. কামাল ও অন্যান্য (সম্পা)। (২০১০)। *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

৪. খান, মো. আলী আকবর ও দে, তপনকুমার। (২০০৮)। *বাংলাদেশের কয়েকটি জনগোষ্ঠী*। ঢাকা: কথন প্রকাশন।

৫. ঘোষ, সুবোধ। (২০০০)। *ভারতের আদিবাসী।* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৬. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। (২০১২, ১৯৪৫)। *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ।* কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৭. রহিম, মুহাম্মদ আবদুর ও অন্যান্য। (১৯৭৭)। *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

৮. সাত্তার, আবদুস। (১৯৬৬)। *আরণ্য জনপদে।* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

৯. সিকদার, সৌরভ। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১০. সিকদার, সৌরভ। (২০০৫)। *হুল*। ঢাকা: জাতীয় উদযাপন কমিটি।

১১. হাঁসদা, গাব্রীয়েল। (২০০৯)। *সান্তাল সমাজ ও রীতিনীতি*। রাজশাহী: আদিবাসী বিকাশ কেন্দ্র।

১২. সুর, অতুল। (১৯৯২)। *বাঙালি জীবনে নৃতাত্ত্বিকরূপ।* কলকাতা: বেস্টবুকস্

১৩. Grierson, G. A. (1904.). *Linguistic Survey of India*. Delhi: Low Price Publications.

১৪. Kamal, Mesbah and Others. (2014). *Mapping of multilingual education programs in Bangladesh*. Dhaka: The UNESCO.

১৫. Kim, S eung and others. (2010). *The Santali Cluster in Bangladesh*. Dhaka: SIL.

১৬. *প্রাচীন বাংলার জনপদ* (2014). https://www.teachers.gov.bd/content/

১৭. চৌধুরী, আবদুল মমিন। (২০১৪)। *বঙ্গ।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org/

১৮. উদ্দিন আহমেদ, হেলাল। (২০১৫)। *ইতিহাস।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org

১৯. Violatti, Cristian. (2014). *Ancient History Encyclopedia.* Retrieved from http://www.ancient.eu

পঞ্চম অধ্যায়

সাঁওতালি ভাষা

সাঁওতালদের ভাষার নাম সাঁওতালি। এ ভাষাটি সাঁওতাল জাতির নাম থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। তবে এর অন্য নামও প্রচলিত রয়েছে। অনেকে এ ভাষাকে হড়, হড়-রাঢ়, হোড়, সামতালি, সান্ডাল, সাংতাল, সান্তাল, সান্তালি, সান্থায়ালি, সাতার, সেন্তালি, সন্থাল (এথনোলগ) নামে অভিহিত করেন। সাঁওতালি শব্দের সাধারণ অর্থ সাঁওতালদের ভাষা। রেভারেন্ট এল ও স্কেফস্রুড এর (Skrefsrud, 1873) মতে বাঙালিরা এদের সাঁওতাল বা সাওতার নামে সম্বোধন করত। পড়ে ব্রিটিশ শাসনামলে এ নামটিই সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

সাঁওতালি ভাষার প্রধান ভাষী অঞ্চল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম, ওড়িস্যা। এছাড়া এ ভাষার ভাষীদের দক্ষিণ এশিয়ার আরো দুটি দেশ নেপাল ও বাংলাদেশে প্রচলিত। বাংলাদেশে বেশিরভাগ সাঁওতালি ভাষী বাস করে উত্তরাঞ্চলে। পূর্বের অধ্যায়ে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

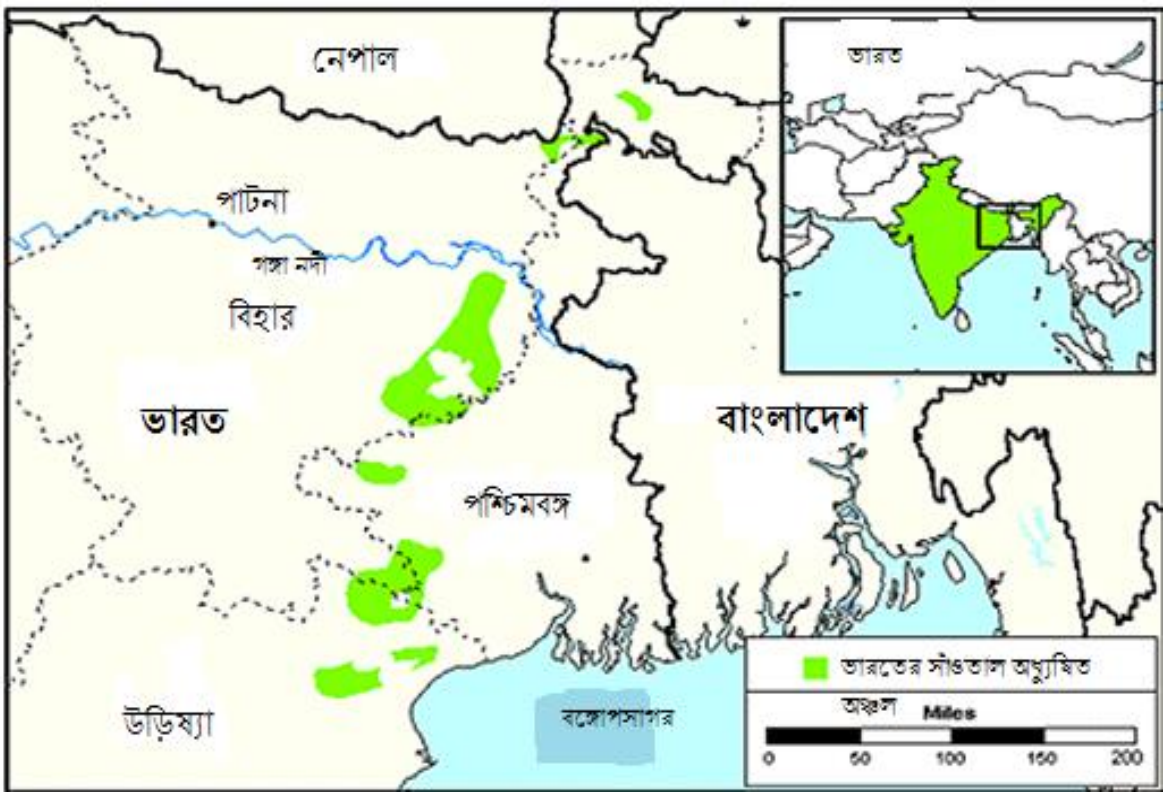

চিত্র: ভারতে বর্তমানে সাঁওতাল ভাষী অঞ্চল (সূত্র-ইন্টারনেট)।

ভাষাপরিবার (Language Family)

সাঁওতালি ভাষা বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র একটি ভাষা। এটি অস্ট্রোএশীয় ভাষা-পরিবারের মুন্ডা গোত্রের একটি ভাষা। মুন্ডা ভাষাপরিবারের প্রায় ৫৭ ভাগ মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। গ্রিয়ারসন এ প্রসঙ্গে বলেন,

> 'Munda family has been known under various names. Hadgson classed the languages in question under the head of tamulian. Ho, Santali, bhumij, kurukh and Mundari are, according to him dialect of the great kol language (1906, p.7).'

পরিবারের নাম মুন্ডা হিসেবে উল্লেখের ব্যাপারে গ্রিয়ারসন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল এর উদ্ধৃতি টেনে জানান,

> 'The denomination munda was not long allowed to stand unchallenged. Sir George cambell in 1866 proposed to call the family kolarian (1906, p. 8).'

মুন্ডা ভাষাগোত্রের সঙ্গে অন্য ভাষা-পরিবারের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে গ্রিয়ারসন আরো বলেন মুন্ডা এবং দ্রাবিড় ভাষীরা নৃতাত্ত্বিকভাবে একই পরিচয় বহন করলেও ভাষাগত দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি কোল, হো এবং মুন্ডারি ভাষার সাথে অনেকে সাঁওতালি ভাষার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে বলে তথ্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মন খেমের ও মুন্ডা গোত্রের ভাষাগুলোর একটি তুলনামূলক উপস্থাপনাও রয়েছে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে। এছাড়া পশ্চিম বঙ্গে তৎকালীন সময়ে স্থানভেদে সাঁওতাল ভাষায় আর্য ভাষা যেমন বিহারি, বাংলা ভাষার প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

স্যার গ্রিয়ারসনের পূর্বে রেভারেন্ট স্কেফস্রুড তার গ্রন্থের ভূমিকায় সাঁওতালি ভাষার এই সাদৃশ্যগত দিক সম্পর্কে জানান, তিনি মূলত সম্পর্কিত সবগুলো ভাষার মধ্যে সাঁওতালি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দৃঢ়তা খুজে পান। তার মতে,

> 'It is spoken with hardly more than a dialectical difference, in common by shanthals, kolhes, kodas, mahle, mundas, hos and korkos; but in grammatic structure santhali is as superior to the others as Sanskrit ti its cognate languages (1873, Intro.).'

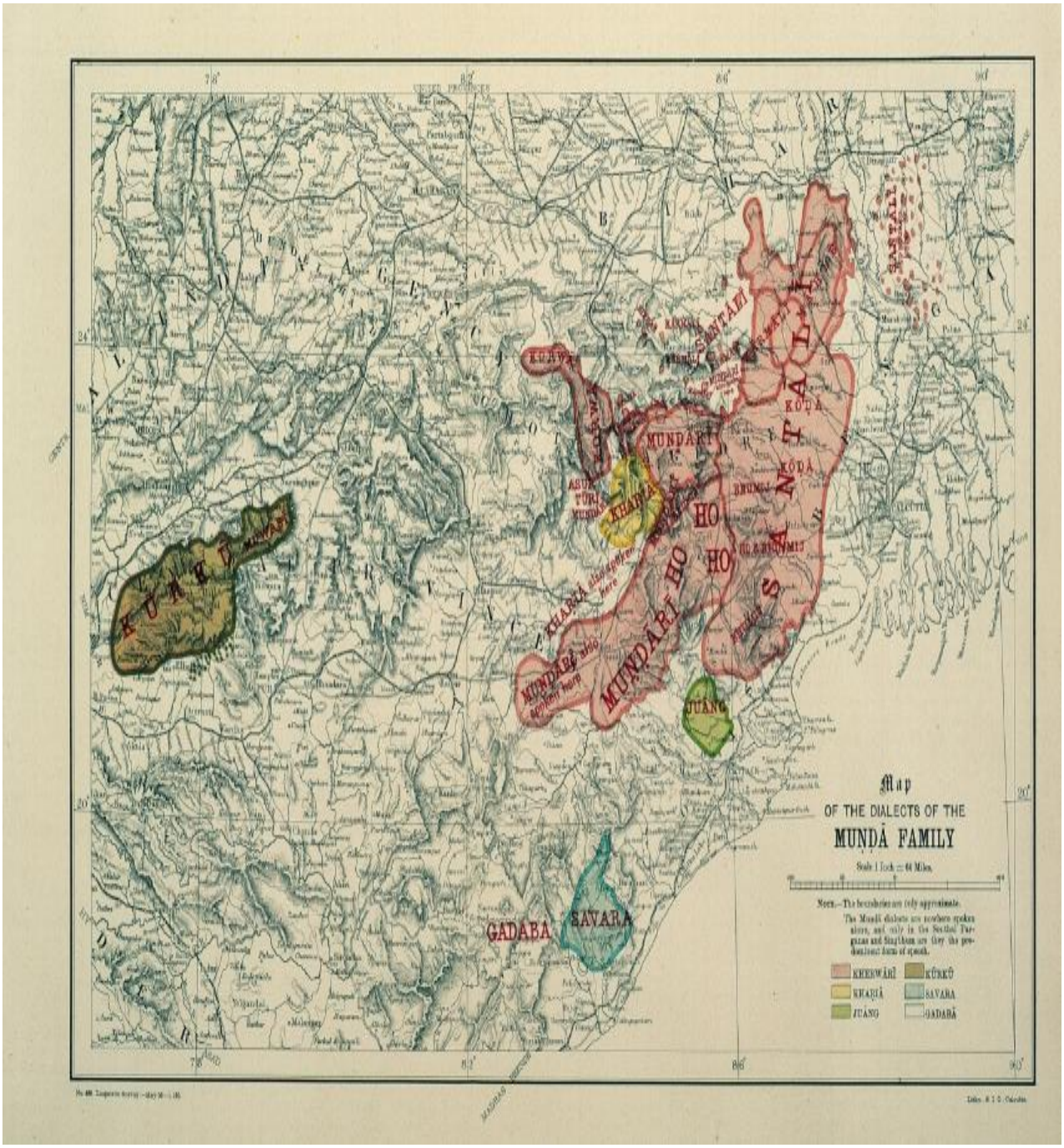

চিত্র: লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় বর্ণিত সাঁওতালি ভাষী অঞ্চল।

আমরা সাঁওতালি ভাষার ভাষাপরিবার ভিত্তিক শ্রেণিকরণ করতে পারি এভাবে-

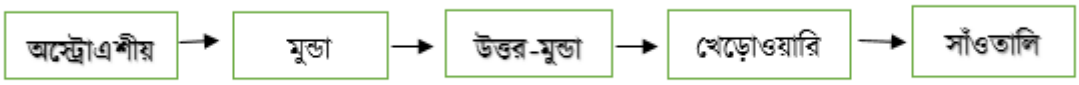

উপরের চিত্রে সাঁওতালি ভাষার ক্রমবিবর্তন দেখানো হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন আদিতে অর্থাৎ অস্ট্রিক জাতির এ ভূ-খণ্ডে আগমনের প্রাক্কালে অস্ট্রিক জাতি-গোষ্ঠী হো, মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল একটি ভাষাতেই কথা বলত, সে ভাষাটি হল মুন্ডা। কালের বিবর্তনে আদি-মুন্ডা ভাষাটির বিভিন্ন রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে সাঁওতালিসহ বেশ কিছু ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এটি আদি ভাষা হওয়ায় বাংলাসহ অন্যান্য আধুনিক যুগের ভাষাগুলোতেও মুন্ডা ভাষার প্রচুর ভাষিক উপাদানের সন্ধান মেলে।

উপভাষা (Dialect)

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের মতে, সাঁওতালি ভাষার দুটি উপভাষার সন্ধান পাওয়া যায়।

ক) মাহলে

খ) কারমালে

কারমালি উপভাষা সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, হাজারিবাগ এবং মাহলে সাঁওতাল পরগণার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ এবং মানভূম ও বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য গ্রিয়ারসনের লিঙ্গুস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় প্রদেয় তথ্যসমূহ শত বছরের পুরোনো এবং সে সময় গ্রিয়ারসন ঠিক কোন উপাত্তের ভিত্তিতে এ দুটি ভাষিক রূপকে সাঁওতালি ভাষার উপভাষা বলেছিলেন তা জানা যায় না। তবে গ্রিয়ারসন উল্লিখিত এ দুটি ভাষা রূপের একটি মাহলে ভাষীরা বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র্য জাতি হিসেবে পরিচিত এবং মাহলে ভাষাও একইভাবে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যধারী। এ দুটি ভাষা একই ভাষাপরিবার জাত হওয়ায় এই দুই ভাষার ভাষীদের মধ্যে পরস্পর বোধগম্যতা বা Mutual Intelligibility রয়েছে।

ভারতে সাঁওতালি ভাষীদের বড় অংশটি বাস করায় সেখানে অঞ্চল ভিত্তিতে এ ভাষার উপভাষিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ও সংস্থার গবেষণাতেও তার উপস্থাপন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ভাষা গবেষণা

প্রতিষ্ঠান সামার ইনিস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিক বা SIL ৫টি উপভাষার কথা উল্লেখ করেছে। এগুলো হলো কারমালি (কহলে), কামারি সান্তালি, মাঞ্জি, পাহাড়িয়া।

সাঁওতালি ভাষীদের কাছে তথ্য সংগ্রহ প্রাক্কালে এদেশে সাঁওতালি ভাষার কোন উপভাষা নেই বলে জানা যায়। তবে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতালি ভাষায় ২ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান (Kim and Others, 2010)। সিকদার (২০০৫) জানান যে, বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষার চোখে পড়ার মত পার্থক্য রয়েছে। তিনি রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জের সাঁওতালি ভাষার সাথে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের উপভাষিক বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে এসব অঞ্চলে সাঁওতালি ভাষার শব্দভাণ্ডারগত পার্থক্যও বিদ্যমান।

সাঁওতালি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Linguistic Features of Santali Language)

সাঁওতালি ভাষা বিশ্লেষণ করলে নিচের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই-

১) এটি একটি বিশেষ্য প্রধান (noun head) ভাষা।

২) এ ভাষার পদক্রম কর্তা কর্ম ক্রিয়া (sov)। যেমন আমি ভাত খাই- / iõd̪o d̪akan jomed̪a/ । কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় নঞর্থক না ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

৩) এই ভাষায় প্রচুর দ্বিস্বর ধ্বনি রয়েছে (Grierson, 1906)। তবে স্কেফস্রুড (1873) ১৫টি দ্বিস্বর ধ্বনির কথা উল্লেখ করেছেন।

৪) সাঁওতালি ভাষার স্বরধ্বনি সমৃদ্ধ। মোট ৮টি মৌলিক ধ্বনি পাওয়া যায়। একই স্বরের দীর্ঘ, হ্স্র, নাসিক্য ও নিরপেক্ষ উচ্চারণ দেখা যায়।

৫) শ্বাসাঘাতের সময় সাধারণত দুই অক্ষরের শব্দে প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত বজায় থাকে।

৬) সাঁওতালি ভাষায় আদি মধ্য ও অন্ত্য প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

যেমন: /ik/ প্রত্যয় /giri+ik/> /girik/ (পতিত), /ger+ ɔk/> /gerɔk/ (কামড়ানো)

৭) এই ভাষায় তিন ধরনের বচন রয়েছে- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। দ্বি বচনের ক্ষেত্রে kin প্রত্যয় ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ uni – unkin- unku (সে- ওরা দুজন- ওরা)

৮) সাঁওতালি ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্ম ক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

৯) সাঁওতালি ভাষায় পুরুষ ৩টি। এগুলো হল- উত্তম, মধ্যম ও নাম।

১০) অনেক ভাষাতেই কারকের সাথে ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় তা রয়েছে। ৪ ধরনের কারক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, এগুলো হল- কর্তৃকারক (Nominative), সম্বন্ধপদ (Genetive), সম্প্রদান (Dative) ও কর্মকারক (Accusative) ।

লিখনরীতি (Writing System)

সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিখনরীতি নেই। তবে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পনের সাথে সাথে এই ভাষায় বিভিন্ন সময় নানা লিপি ব্যবহার হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ ভাষাটির জন্য অলচিকি, রোমান, দেবনাগরি, বাংলা, উড়িয়া লিপির ব্যবহার হয়েছে। ধরণা করা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাঁওতালদের বসতি থাকায় কখনো স্থানীয় প্রভাব, কখনো ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত প্রভাবে সাঁওতালি ভাষায় এসব লিপির ব্যবহার হয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারিরাই সাঁওতালি ভাষায় প্রথম লেখ্য রূপ প্রদান করে ১৮৯০ সালে। লুথারিয়ান পাদ্রি পল ওলাফ বোডিং এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাঁওতালি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন এবং ১৯১৪ সালে সাঁওতালি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। সাঁওতাল পরগণাই ছিল এসব প্রকাশনার মূল প্রচার কেন্দ্র। রোমান বর্ণমালা অনুসৃত সাঁওতালি বর্ণমালায় বর্ণ সংখ্যা ২৮টি। যার মধ্যে ২২টি বর্ণ মূল বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি ৬টি ধ্বনি পার্থক্য নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় (সিকদার ও পলি, ২০১৬)। এগুলো বাম থেকে ডান দিকে লেখা হয়।

বাংলাদেশে সাঁওতালিদের মধ্যে রোমান হরফ প্রচলনের দুটি সময়কালের তথ্য পাওয়া যায়। কারো কারো মতে সাঁওতালি ভাষা লিখনে রোমান বর্ণমালার প্রচলন শুরু হয় ১৮৬৭ সালে অন্য আরেকটি মতানুসারে এর প্রচলন হয় ১৯২৫ সালে (হেম্ব্রম, ২০০৮)।

a	b	c	d	e	F
g	h	i	j	k	l
m	n	o	p	r	s
t	u	w	y		

চিত্র: রোমান লিপি অনুসৃত সাঁওতালি রোমান লিপি।

ভারতে সাঁওতালি ভাষা লিখনে অলচিকি বর্ণমালা প্রচলিত। বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ১৯২৫ সালে অলচিকি নামে সাঁওতালি বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। এর পূর্বে সাধু রামচাঁদ মুর্মু ১৯২৩ সালে মতান্তরে ১৯২১ সালে মজ-দাঁদের আঁক নামের একটি বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। তবে তা সুপ্রচারিত হয়নি। ১৯২৫ সালে রঘুনাথ মুর্মু তাঁর রচিত উপন্যাস বিধু চন্দনে অল সেমেট /ɔl cemet/ বা অল চিকি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। অল সেমেট /ɔl ciki/ শব্দের অর্থ লেখা শেখা।

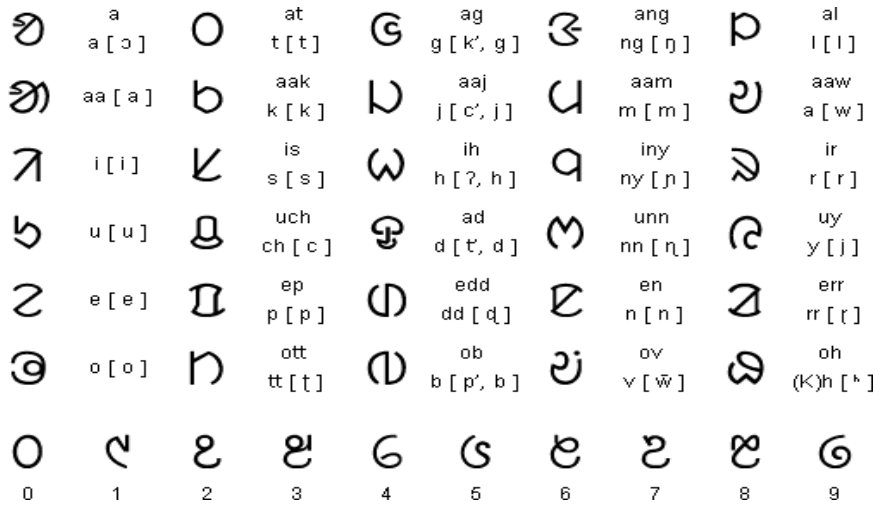

চিত্র: অলচিকি বর্ণমালা।

১৯৭৯ সালে এই বর্ণমালা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অলচিকি ও রোমান লিপি ছাড়াও সাঁওতালি ভাষা বাংলা বর্ণেও লিখিত হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে মাঝি রামদাস টুডু সর্বপ্রথম বাংলা লিপিতে সাঁওতালি কাব্য লেখেন ১৮৯৪ সালে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের সাঁওতালরা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের মধ্য রোমান বর্ণমালার ব্যবহার দেখা যায়। পাশাপাশি তাদের মধ্যে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারও বিদ্যমান।

সাঁওতালি সাহিত্য (Santali Literature)

সাঁওতালি ভাষার লিখিত রূপ না থাকায় এ ভাষার প্রাচীন সাহিত্যগুলো মৌখিক। অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত। তবে গান, ছড়া, উপকথায় তা সমৃদ্ধ। লৌকিক নানা আচারে সাঁওতালরা এগুলোর ব্যবহার করে থাকে। লিখিত ভাবে সাঁওতালি ভাষার প্রথম নিদর্শন ১৮৬৯ সালে ভারতের সাঁওতাল পরগণার লুথারিয়ান মিশনে স্থাপিত ছাপাখানা থেকে সাঁওতাল ভাষার ব্যাকরণ ও অন্যান্য বই প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে চিকিৎসক সি আর লেন্সাস এই

বর্ণমালা ব্যবহার করে সর্বপ্রথম vocabulary of Santali language রচনা করেন। পল ওলাফ বোডিং সাঁওতালদের প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি রোমান বর্ণমালায় সাঁওতালি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।

এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের An Introduction TO Santal language (1852), a grammar of the santal language(1873) পি ও বোডিং এর দ্বিতীয় খণ্ডে materials of the santal grammar (1929) গ্রন্থে সাঁওতালি ভাষার উৎস শব্দকোষ ও ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালে বাংলা লিপিতে মাঝি রামদাস টুডু সান্তালি ভাষায় কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের নাম খেরোয়াল বংশা ধরম পুঁথি।

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে সাঁওতালি রোমান বর্ণমালায় পত্রিকা প্রকাশ হয় এবং বেসরকারিভাবে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের বেশকিছু পাঠ্যপুস্তকও প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষার ভাষিক অবস্থান (Linguistic Situation of Snatali Language in Bangladesh)

বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। ফলে এদেশে যেসব ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী ভাষা রয়েছে সেগুলোর রাষ্ট্রীয় কোনো স্বীকৃতি নেই। বৃহত্তর সমাজেও এই ভাষাগুলোর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসী ভাষাগুলোর মতো সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রেও চিত্রটি একইরকম। উত্তরবঙ্গের এই বৃহৎ ও পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ভাষাটিতে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু উন্নয়ন সংস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও এক্ষেত্রে নেই কোন যথাযথ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ২০১০ সালের বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (আদিবাসী) ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সে তালিকায় উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা সাঁওতালি স্থান পায়। তবে সাঁওতালিদের নিজেদের মধ্যে লিপি বিতর্ক থাকার কারণে ২০১৭ সালে তালিকায় থাকা অন্য পাঁচটি ভাষা- চাকমা, সাদরি, মারমা, ককবরক, গারো–তে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হলেও সাঁওতালি ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

সাঁওতালি ভাষার ভাষীরা সাধারণত দ্বিভাষী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুভাষী। আমরা মাঠ গবেষোণায় এমন কিছু ভাষীও পাই যারা দুটি ভাষায় সমান্তরালে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন আবার অন্য প্রতিবেশী ভাষাগুলোও বুঝতে পারেন। সাধারণত একটি সাঁওতাল আদিবাসী গ্রামের আশে পাশে বাঙালি বসতি থাকে, কখনো কখনো সাদরি ভাষী পরিবারও থাকে ফলে অনেক সাঁওতালি ভাষীই একটি মিশ্র ভাষিক-পরিবেশে নিজের ভাষিক দক্ষতা অর্জন করে। সে কারণে একইসাথে এক বা একাধিক ভাষা অর্জন একজন সাঁওতালি ভাষীর জন্য কঠিন নয়।

পারিপার্শ্বিকতা অনেক ক্ষেত্রেই ভাষীকে ভাষা অর্জনে বা শিখনে সাহায্য করে থাকে। বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ভিন্ন নয়। আঞ্চলিক বাংলা ভাষা বা আঞ্চলিক সাদরির প্রভাব থাকলেও সাঁওতালি ভাষার ভাষিক পরিবেশ রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে যতটা প্রতিকূলে, সামাজিক অবস্থানে বৈচিত্র্যময়। বিশেষত একাধিক ভাষা অর্জন এবং মাতৃভাষার শিক্ষা প্রসারের সুযোগ না থাকায়।

তথ্যসূত্র

১. কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.)। (২০০৭)। *আদিবাসী জনগোষ্ঠী।* ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

২. কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.)। (২০১০)। *বাংলাদেশের আদিবাসী।* ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

৩. মুরমু, মিথুশিলাক। (২০০৯)। *আদিবাসী অন্বেষণ।* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান।

৪. সিকদার, সৌরভ। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা।* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৫. সিকদার, সৌরভ ও পলি, নাসিমা। (২০১৬)। *বাংলাদেশের ভাষা ও লিপি।* ঢাকা: অনন্যা।

৬. সিকদার, সৌরভ। (২০০৫)। *সাঁওতালি ও ওঁরাও ভাষা শব্দাবলি ও ভাষাশিক্ষা।* ঢাকা: অক্সফাম জিবি।

৭. হাঁসদা, গাব্রীয়েল। (২০০৯)। *সান্তাল সমাজ ও রীতিনীতি।* রাজশাহী: আসিবাসী বিকাশ কেন্দ্র।

৮. হেম্ব্রম, হিলারিয়াস (সম্পা.)। ২০০৮। *তেরাঙ*। জয়পুরহাট: মহান সান্তাল হুল ১৫৩ তম বর্ষপূর্তি দিবস উদযাপন কমিটি ২০০৮।

৯. Cavallaro, Francesco & Rahman, Tania. (2009). *The Santhals of Bangladesh*. Singapore: Nanyang Technological University.

১০. Grierson, G.A. (1906). *Linguistic Survey of India.(vol iv)* . Calcutta: Office of the suptt. Government printing press, india.

১১. Kamal, Mesbah & Others. (2014). *Mapping of Multilingual Education Programs in Bangladesh*. Dkaka: UNESCO.

১২. Kim, Seung and Others. (2010). *The Santali Cluster in Bangladesh: A Sociolinguistic Survey.* Dhaka : SIL International.

১৩. Skrefsrud, L. O, (1873). *A Grammar of Santhal Language*. Benares: The Calcutta School Book and Vernacular Literature Society.

১৪. *Santhali.* (2017). Retrieved from https://www.ethnologue.com/language/sat

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় ভাষা অর্জন ও সামাজিক প্রতিবেশ

মানব জাতির পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যম হল ভাষা। জন্মের পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যে মানব শিশু ভাষা অর্জন করে। ভাষা অর্জনে মস্তিষ্কের সংক্রিয়া ভাষাবিজ্ঞানের একটি জটিল পাঠ। মানুষের ভাষা অর্জনে সাধারণত অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে তার পরিবার। পাশাপাশি সামাজিকভাবে একটি শিশুর দেখা, শোনা ও বোঝার ক্ষমতা তাকে একটি ভাষার পূর্ণাঙ্গ ভাষী করে তোলে। অর্থাৎ একই জাতির অন্য ভাষীর সাথে সে কথা বলতে পারে। জন্মের পর থেকে অর্জিত শিশুর প্রাথমিক ভাষা, মায়ের ভাষা বা স্বজাতির ভাষাই হল তার প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা। একইভাবে প্রথম ভাষা ব্যতীত একজন ভাষী যখন অন্য আরেকটি বা একাধিক ভাষা বলতে সক্ষম হয় তখন সেটি বা সেগুলো তার দ্বিতীয় ভাষা। দ্বিতীয় ভাষা কি এ প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলো এরকম-

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics অনুসারে,

> 'A language which is not native to a community but has an established role for certain purposes or at a certain social level (3rd ed. 2014).'

দ্বিতীয় ভাষা গবেষক Muriel Saville-troike জানান,

> 'A second language is typically an official or societally dominant language needed for education, employment and other basic purposes.it is often acquired by minority group members or immigrants who speak another language natively (Saville-troike, 2006, p.4).'

Jack Richards ও অন্যান্যরা মনে করেন,

> 'A second language is a language which is not a native language in a country but which is widely used as a medium or communication (eg in education and in government) and which is usually used alongside another language or languages (Richards and Others, 1985, p. 108).'

উপরের সংজ্ঞাগুলোর ওপর আলোকপাত করলে দ্বিতীয় ভাষা সম্পর্কে আমাদের প্রধান যে ধারণাটি আসে তা হল, দ্বিতীয় ভাষা হল এমন একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষা যা ভাষীর প্রাথমিক ভাষা না হলেও সামাজিক যোগাযোগের

নানা ক্ষেত্রে আবশ্যক। বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানী মহাম্মদ দানীউল হক এ বিষয়ে একটি মতামত উপস্থাপন করেছেন। তার মতে,

> 'মানুষ নিতান্তই শিশুকাল থেকে, মায়ের কাছ থেকে বা তাঁর লালন-পালনকারীর কাছ থেকে অথবা নিছক তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে যে ভাষা শেখে এবং আয়ত্ত করে সেটাই তার প্রধান বা প্রথম ভাষা। এরপরে, কিঞ্চিৎ বয়স বাড়লে স্কুলে বা বাইরের জগতে গেলে মানুষ যদি আরো একটি ভাষা শেখে অথবা তার নিজের প্রথম ভাষার পরও যদি তাকে আরো একটি ভাষা ব্যবহার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে সেটিকেই প্রাথমিকভাবে বলা হয় দ্বিতীয় ভাষা (হক, ২০০৭, পৃ ৪০)।'

দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বিষয়টি আজ ভাষা-শাস্ত্রে একটি আগ্রহ উদ্দীপক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তব গবেষনার সাথে সাথে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের বিস্তার হয়েছে। বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের কারণে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনযোগ্য। আমাদের আলোচনায় তাই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা সম্পর্কিত আবশ্যক কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষা অর্জন ও শিখন (Second Language Acquisition and Learning)

ভাষা অর্জন ও ভাষা শিখন ধারণা দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তত্ত্বগত দিক থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমাদের গবেষণা শিরোনামার সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সে দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। বর্তমান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণত একজন দ্বিতীয় ভাষা শিখতে আগ্রহী ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় ভাষা শিখন করতে দেখা যায়। মূলত ব্যক্তি যখন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে চায় তখন সে অন্য আরেকটি ভাষা শিখনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সাধারণত ভাষীদের মধ্যে বৈশ্বিক সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা শেখার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন বাঙালির কাছে বাংলা ভাষা তার প্রথম ভাষা। বৈশ্বিক যোগাযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করে একজন বাঙালি যদি ইংরেজি বা জার্মন ভাষা শেখে তবে সে ভাষাটি তার দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ভাষা শিক্ষার সাম্প্রতিক ধারণা অনুসারে দ্বিতীয় ভাষা শুধু শিক্ষা নয়, অর্জনও সম্ভব (Annamaria, 2011)। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ভাষিক পরিবেশের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার মতোই দ্বিতীয় ভাষাও কিছু চিরন্তন রীতি মেনে হয়। এমনকি অনেক সময় তা স্বেচ্ছাকৃতও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি সার্বজনীন ব্যাকরণ তত্ত্ব বা ইউনিভার্সাল গ্রামার থিওরির (১৯৬২) বিষয়টি আলোচনা করা যায়। চমস্কির মতে মানুষের ব্যাকরণিক বোধগম্যতা মস্তিষ্কে সুপ্ত অবস্থাতে থাকে। সমষ্টিগতভাবে এই ব্যাকরণিক নিয়মগুলো ইউনিভার্সাল গ্রামার বা সার্বজনিন ব্যাকরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। তার মতে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক ভাষার স্বনিম সংখ্যা, স্বনিমের

ক্রিয়া পদ্ধতি, শব্দরূপ-ধাতুরূপ বিধান ও বাক্যগঠন প্রথম তবু সব ভাষার মধ্যে কিছু সাধারণ ধর্ম আছে এবং সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে কিছু মূলীভূত ঐক্য আছে। বিভিন্ন ভাষা ও ব্যাকরণের মধ্যে মূলীভূত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের মূল ঐক্য যে মনুষ্য–প্রকৃতি তার উপরে। জাতিতে জাতিতে যত পার্থক্যই থাকুক মানুষ সবর্ত্র মূলত এক, তার রক্ত-মাংসের দেহ, তার দেহযন্ত্র বাগযন্ত্র থেকে শুরু করে তার গভীর মানবিক চাহিদা এবং তার উচ্চতর মানবিক অনুভূতি মূলত এক। এর ফলে সব জাতির ভাষা প্রক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণে একটা মূল সর্বগত ঐক্য আছে (হক, ১৯৯৩; শ', ২০০৪)।

ইউনিভার্সাল গ্রামারের প্রধান ধারণা হল এটি একটি সহজাত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মদক্ষতা যা একজন শিশুকে মৌলিক ভাষিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যাকরণিক স্তরে পৌছে দেয়। UG সম্ভাব্য ভাষীর প্রথম ভাষার ব্যাকরণ কেমন হবে, সে লক্ষ্যে ভাষীর মস্তিষ্কে জাতি-বৈশিষ্ট্যসূচক একটি নকশা (Generic Blueprint) প্রণয়ন করে। ফলে ভাষীর প্রথম ভাষার অর্জিত হয় (White,2003)। প্রথম ভাষার মতো দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও ইউনিভার্সাল গ্রামার যৌক্তিকভাবে কার্যকর থাকে। এ মত অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই সমর্থন করেছেন (White, 2003; Doughty and Michal, 2003)। তাদের মতে, শিশুর ভাষা অর্জনের ধরণ যে কোনো ভাষার জন্য একই থাকে। সেক্ষেত্রে ব্যাকরণটি অবচেতন ভাবেই শিশুর মস্তিষ্কে সংস্থাপিত হয় ফলে একজন ভাষী যখন শিশু থাকে কিংবা শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, উভয় অবস্থাতেই সে মাতৃভাষা ছাড়াও একাধিক ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অর্জন করতে পারে (প্রাগুক্ত)।

চমস্কির ইউজি থিওরিকে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত ভাবে সন্নিবেশিত করতে পারি--

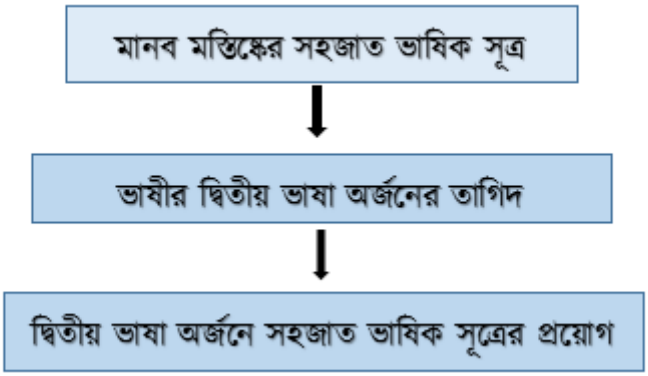

চিত্র: দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে চমস্কির *ইউনিভার্সাল গ্রামার*-এর কার্যপ্রনালী।

সুতরাং চমস্কির তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় যে মানুষের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের দক্ষতা সহজাত। দ্বিতীয় ভাষা কেবল শ্রেণিকক্ষে শিখনের মাধ্যমে নয় বরং প্রতিবেশ অনুসারে অর্জন করাও সম্ভব।

তবে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন ও শিখনের মধ্যে অর্থগত একটি দ্বান্দ্বিকতা থেকে যায়। যা আমাদের আলোচনার স্বার্থে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় ভাষা অর্জন কী, এ সম্পর্কে কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর মতামত আলোচনা করতে পারি।

Vivian Cook এর মতে,

> 'L2 users are not necessarily the same as L2 learners. Language *users* are exploiting whatever linguistic resources they have for real-life purposes . . . . Language *learners* are acquiring a system for later use" (Cook, 2002)'

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার্থীর সাথে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারকারীর পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারকারী দৈনন্দিন নানা কাজে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ব্যবহার করে, অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার্থী একটি সংশ্রয় অর্জনের মাধ্যমে পরবর্তী ভাষা ব্যবহারে প্রস্তুত হয়।

Gass ও selinker এর বক্তব্যে

> 'In general, SLA (second language acquisition) refers to the process of learning another language after the native language has been learned. Sometimes the term refers to the learning of a third or forth language. The important aspect is that SLA refers to the learning of a nonnative language after the learning of the native language...by the term, we mean both the acquisition of a second language in a class room situation as well as in more natural exposure situation (2008, p.7).'

উপরের বক্তব্য অনুসারে মাতৃভাষা অর্জনের পরে অন্য আরেকটি ভাষা শেখার প্রক্রিয়াই হল দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করা। এক্ষেত্রে ভাষী দুইটিরও অধিক ভাষাও অর্জন করতে পারে। লেখকদ্বয় মাতৃভাষা শেখার পরে ভাষী যখন দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করতে শুরু করে তখন তা শ্রেণিকক্ষ বা তার বাইরের পরিবেশেও অর্জিত হতে পারে। এখানে লক্ষণীয় যে, Gass ও selinker দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের শিখনকেও একীভূত করে নিয়েছেন। অর্থাৎ একজন ভাষী যেভাবেই ভাষা ২ এ দক্ষতা অর্জন করুক না কেন, তা মূলত ভাষা অর্জনেরই নামান্তর।

ভাষীর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় সক্রিয় থাকতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানী মহাম্মদ দানীউল হক সামাজিকভাবে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা আয়ত্তকরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সম্ভবনা দেখিয়েছেন--

ক) মাতৃভাষায় অভ্যস্ত হয়ে শিশু যদি স্কুলে গিয়ে আরেকটি ভাষা আয়ত্ত করে।

খ) প্রাথমিকভাবে মাতৃভাষা ব্যবহার করলেও শিশু যদি বাইরের পরিবেশে অন্য একটি ভাষা ব্যবহার করে।

গ) শুধুমাত্র নিজের ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে কর্ম জীবনে যদি আরো একটি ভাষা ব্যবহার করতে হয়।

ঘ) কোন শিশুর মাতা একভাষী কিন্তু পিতা বা ঘরের লোক যদি অন্যভাষী হয়, এবং শিশুকে যদি একটি ভাষার সঙ্গে আরো একটি ভাষা ব্যবহার করতে হয়।

ঙ) নিজস্ব ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে একটি ভাষা ব্যবহার করলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আরো একটি ভাষা ব্যবহার করতে হলে।

চ) দৈনন্দিন জীবনে এক ভাষা, কিন্তু ধর্মীয় কারণে অন্যভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হলে।

ছ) দোভাষীর কাজ চালাতে গিয়ে যে কোনো একটি ভাষাকে প্রথম ভাষা ধরা হলে অপর ভাষাটি দ্বিতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য লাভ করবে (হক, ২০০৭, পৃ ৪১)।

শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে আরো বেশ কিছু ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কারো কারো মতে দ্বিভাষী শিশু তৃতীয় আরেকটি ভাষা অর্জনে দক্ষ হয়ে ওঠে (Halgunseth)। অবশ্য Genesee (2008) বলেন শিশুর পক্ষে অনেক সময় তৃতীয় আরেকটি ভাষা শেখা কঠিন ও সময় সাপেক্ষ হতে পারে। তবে ব্যক্তিভেদে অর্জন ভিন্ন হতে পারে। Genesee আরো জানান দ্বিভাষী শিশু একভাষী শিশুর তুলনা ধীর শিখন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। দ্বিতীয় ভাষা অর্জন অল্প সময়ের জন্যও হতে পারে। অর্থাৎ ভাষী দ্বিতীয় ভাষা ভুলে যেতে পারে তা অর্জনের পর। Genesee এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যে একজন ভাষী তার দাদার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ভিন্ন ভাষী দাদার ভাষার কিছুটা অর্জন করতে পারে এবং পরবর্তীতে তা ভুলেও যেতে পারে। তিনি আরো জানান দ্বিভাষিকতা অনেক সময় শিশুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলতে পারে।

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের প্রভাবক (Motivator of Second Language Acquisition)

একজন ভাষীর প্রথম ভাষা থাকার পরও স্বতস্ফূর্তভাবে আরেকটি ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু মানসিক প্রভাবক কাজ করে। ভাষা অর্জনে এই প্রভাবকগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা প্রভাবকের মাধ্যমে একজন ভাষী একটি ভাষা অর্জনে উদ্দীপনা পেয়ে থাকে-

প্রেষণা (Motivation)

অন্য আরেকটি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভাষীর মধ্যে প্রেষণা থাকা প্রয়োজন। কোন প্রেষণা ছাড়া ভাষী ভাষা অর্জনে আগ্রহী হয় না। প্রেষণা আসে সামাজিক প্রয়োজন থেকে। অর্থাৎ অন্য ভাষার ভাষীর সাথে যোগাযোগ, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা মাধ্যম ইত্যাদি প্রেষণা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ফলে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেষণা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

বয়স (Age)

বয়স দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। বয়সের উপর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ধরণ অনেকখানি নির্ভরশীল। অনেক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে শিশুদের ভাষা অর্জনের সক্ষমতা বেশি। এ প্রসঙ্গে Brown (2007) জানান,

> 'Critical point for second language acquisition occurs around puberty, beyond which people seem to be relatively in capable of acquiring second language (p. 58).'

তিনি আরও মনে করেন ১২-১৩ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষমতা লোপ পায়। তবে এই মতের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ভাষাবিজ্ঞানী White and genesee (1996) তাদের একটি গবেষণায় দেখেন ১২ বছরের পর পূর্ণবয়স্ক শিক্ষার্থীরাও একইভাবে ভাষা অর্জন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করা শিশুদের চেয়ে ভাল ভাবে ভাষা শিখছেন।

ভাষা সংশ্লিষ্টতা (Access to the Language)

যখন একজন ভাষী দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করেন তখন সেই ভাষার সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকা বিশেষ প্রভাব রাখে। অর্থাৎ ভাষী যেন সেই ভাষা পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়। এতে করে ভাষী অন্য ভাষাটি শিখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ভাষা সংশ্লিষ্টতা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে বিশেষ প্রভাব রাখে।

ব্যক্তিত্ব (Personality)

ব্যক্তিভেদে ভাষা অর্জনের পার্থক্য হয়। অর্থাৎ ভাষীর জ্ঞানীয় দক্ষতা এক্ষেত্রে ভাষা অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। কোনো কোনো ভাষী দ্রুততার সাথে অন্য আরেকটি ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব ভাষা অর্জনে ভাষীর জন্য একটি প্রভাবক।

প্রথম ভাষার বিকাশ (First Language Development)

ভাষীর দ্বিতীয় অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ জরুরি। প্রথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে একটি বোধগম্যতার সূত্র তৈরি করে। একটি শিশু যদি পরিপূর্ণভাবে মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে পারে তবেই দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সে সাফল্য পায়।

দ্বিতীয় ভাষা শিখন পদ্ধতি (Second Language Learning Method)

জ্যাক সি রিচার্ডস ও থিওডোর এস রজার্স এর মতে,

> 'It has been estimated that some 60 percent of today's population is multilingual (Richards and Rodgers, 2001, p. 3).'

এ কথার সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি বহুভাষী পরিস্থিতিতে একজন ভাষী নানা কারণেই মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্য এক বা একাধিক ভাষা শিখন বা অর্জনে উৎসাহী হতে পারে। আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বিতীয় ভাষা শিখনে সুদীর্ঘকাল হতে বেশকিছু পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে দ্বিতীয় ভাষা শিখনে এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়। নিচে এধরনের কতগুলো প্রধান ভাষা শিখন পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

ব্যাকরণ-অনুবাদ পদ্ধতি (Grammar Translation Method)

মাতৃভাষা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাচীনতম পদ্ধতি হল ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি। এটি মূলত ব্যকরণিক সূত্র নির্ভর একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে ব্যকরণের সূত্র মুখস্তের মাধ্যমে এবং অনুবাদ করার মাধ্যমে ভাষা শেখানো হয়। পূর্বে এটি একটি সমাদৃত পদ্ধতি হসেবে পরিচিত ছিল। ছাত্ররা ব্যাকরণিক সূত্র এবং অনুবাদ করতে পারলেই মনে করা হত সে ভাষাটি সম্পূর্ণরূপে শিখতে পেরেছে। ব্যাকরণ-অনুবাদ পদ্ধতিতে মৌখিক শিখনের উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method)

শিক্ষক ও ছাত্র মুখোমুখি বসে যে ভাষা শিক্ষা করে সেটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। এটি পুরোপুরিই মৌখিক শিখন পদ্ধতি। এতে দ্বিতীয় ভাষাটি লেখার মাধ্যমে শেখানো হয় না। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে শিক্ষক যে ভাবে কথা বলেন তা প্রত্যক্ষ ও

আয়ত্ত করার মাধ্যমে ভাষা শেখে শিক্ষার্থী। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী তার মাতৃভাষা ব্যবহার করার অনুমতি পায় না। ভাল উচ্চারণের দিকে নজর রাখা হয়।

সাংগঠনিক পদ্ধতি (Structural Method)

প্রতক্ষ্য পদ্ধতির সীমাবন্ধতা থেকে বেড়িয়ে এসে যে ভাষাশিক্ষা পদ্ধতি চালু হয় তাতে মূলত মৌলিক ভাষাতাত্বিক্ব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ভাষার ধ্বনি, অর্থ, শব্দ, বাক্য এই চারটি স্তরকে জানা হয় এখানে। এই পদ্ধতিটি সাংগঠনিক পদ্ধতি নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে ব্যাকরণিকভাবে একই ধারার কিছু সূত্র ক্রমানুসারে শিক্ষার্থীকে শেখানো হয়। যেমন continuous to be verb শেখানোর পূর্বে একজন শিক্ষার্থীকে সহায়ক ক্রিয়া (aux. verb) হিসেবে to be শেখানো হয়।

পারস্পারিক যোগাযোগ পদ্ধতি (Communicative Method)

পারস্পরিক যোগাযোগের পদ্ধিতির মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সাধারণ যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষার্থীকে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুসারে কার্যকর যোগাযোগের অনুশীলনের মাধ্যমে ভাষা শেখে। শ্রেণি কক্ষের সকলে এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহন করে।

শ্রবণ-কথন পদ্ধতি (Audio Lingual Method)

শ্রবণ কথন ভাষাশিক্ষা পদ্ধতি এটির নামেরই প্রতিফলন। বক্তব্য অনুশীলন ও শ্রবনের মাধ্যমে এপদ্ধতিতে ভাষা শেখে শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের বিদেশি ভাষা শেখানোয় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে একে আর্মি মেথডও বলা হয়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সাথে এর সাদৃশ্যের জায়গা হল এই পদ্ধতিতেও শিক্ষাথীকে সরাসরি দ্বিতীয় ভাষা শিখতে হয়। প্রথম ভাষার ব্যবহার শেণিকক্ষে নিষিদ্ধ থাকে। তবে শব্দভাণ্ডার গঠনে এই পদ্ধতিতে তেমন জোর দেয়া হয় না। ভাষা দক্ষতা অর্জনের চারটি উপাদানের (শোনা-লেখা-বলা-পড়া) মধ্যে শোনা ক্ষেত্রে এতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং শোনার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ভাষা বলার দক্ষতা অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের তত্ত্ব (Theory of Second Language Acquisition)

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে বেশ কিছু তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে স্টিফেন ক্রাশেনের তত্ত্বগুলো (Krashen,1982) জনপ্রিয়। ক্রাশেন তার Principles and Practice in Language Acquisition গ্রন্থে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কে ৫টি Hypothesis করেছেন। এগুলো হলো:

১) অর্জন শিখন বৈচিত্র্য (The Acquisition Learning Distinction)

আমরা সাধারণত দুটি উপায়ে কোনো একটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে থাকি। ক) অর্জন খ) শিখন। ভাষা অর্জিত হয় অবচেতনভাবে। যখন এই প্রক্তিয়াটি ঘটে তখন আমরা সচেতন থাকি না। শিশু এবং বয়স্ক দু ধরণের মানুষই ভাষা অর্জন করতে পারে। আর শিখন হল ভাষার কিছু নিয়মানুসারে ভাষা শিক্ষা করা। যা আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে জ্ঞান দক্ষতা এবং ব্যকরণের প্রয়োজন পড়ে। ক্রাশেনের হাইপোথিসিস বা প্রকল্পগুলোর মধ্যে অর্জন শিখন বৈচিত্র্যকে তিনি সবচেয়ে মৌলিক প্রকল্প হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন ভাষা অর্জিত হতে পারে বয়স্কদের দ্বারাও।

২) সহজাত-ক্রম প্রকল্প (The Natural Order Hypothesis)

আমরা কিছু সহজাত ক্রমানুসারে (Order) ভাষা অর্জন করে থাকি। এক্ষেত্রে ভাষী ব্যাকরণের কিছু শব্দমূল প্রাকৃতিক ভাবে শেখে। এর মধ্যে বিশেষ কিছু শব্দমূল প্রকৃতিগত ভাবে পূর্বে শেখে। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষী কিছু ব্যাকরণিক উপাদানের (Item) ব্যবহার পূর্বে শেখে কিছু পরে। তবে এর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজই শিখতে থাকা একজন ভাষী /–ing/ marker টির ব্যবহার পূর্বে শেখে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ /–s/ marker (third person singular number) টি পরে শেখে। বাস্তব ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগের সময় তা লক্ষ্য করা যায়। একজন ব্যাকরণিকের কাছে যে ভাষা নিয়মটি খুব সহজ সেটি বাস্তবে একজন দ্বিতীয় ভাষীর কাছে জটিল মনে হতে পারে। এটিই ক্রাশেনের The natural order hypothesis ব্যাখ্যা করে থাকে।

৩) পর্যবেক্ষণকারী প্রকল্প (The Monitor Hypothesis)

মনিটর হাইপোথিসিস ভাষা অর্জন ও শিখনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। একজন দ্বিতীয় ভাষী সচেতন ভাবে যে ভাষার নিয়মগুলো শেখে তা তার মনিটর বা এডিটর হিসেবে কাজ করে। ভাষী যে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ভাষা অর্জন করে তা মূলত সে অর্জন করে, বিদ্যালয় বা অন্যকোথাও শিখনের মাধ্যমে যে ব্যাকরণিক সূত্র সে শেখে তা কেবল তার

ভাষা প্রয়োগে মনিটর হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ যখন ভাষী সচেতন ভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে যায় তখন সচেতন শিখন তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ভাষায় মনিটর ব্যাবহার কারীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় ভাষার নিয়ম জানতে হয়। যদিও ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোনো একটি ভাষার সকল নিয়ম এখনো তৈরি হয়নি। সঠিক আয়ত্তকরণের দিয়ে মনোযোগ দিতে হয়। এক্ষেত্রে ভাষীর স্বাভাবিক গতিতে ভাষা প্রয়োগে সময় প্রয়োজন হয়।

৪) প্রেরণ সমন্ধীয় প্রকল্প (The Input Hypothesis)

ইনপুট হাইপোথিসিস হল একজন ভাষীর পঠন ও শ্রবনের মাধ্যমে তার বর্তমান দক্ষতা উন্নত হওয়া। এটি কেবল ভাষা অর্জনের সাথেই সম্পৃক্ত শিখনের সাথে নয়। এক্ষেত্রে ভাষী ভাষা অর্জনে আগ্রহী হোক বা না হোক ইনপুটের মাধ্যমে তার মধ্যে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট ভাষাটির আয়ত্তীকরণ জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

চিত্র: ক্রাশেনের ইনপুট হাইপোথিসিস এর ক্রিয়া।

৫) আবেগগত শোধক প্রকল্প (The Affective Filter Hypothesis)

ক্রাশেনের মতে এ্যাফেক্টিভ ফিল্টার হল এমন একটি অবস্থা যা ভাষীর অর্জনকে নিয়ন্ত্রন করে। ফিল্টার যখন হাই বা উচ্চ থাকে তখন তা ভাষা অর্জন সহায়ক নয় (যেমন হীনমন্যতা, অস্বস্তি) আবার ফিল্টার যখন নিম্ন বা লো থাকে তখন তা অর্জন বা শিখন সহায়ক (যেমন উচ্চ প্রেষণা, আত্মবিশ্বাস)। এ্যাফেকটিভ ফিল্টার অনুসারে একই রকম শিখন পরিস্থিতিতে দুজন ভাষীর মধ্যে একজন আশানুরূপ ভাষা দক্ষতা অর্জন করতে পারে, অন্যজন করতে নাও পারে।

ভাষা অর্জনের স্তর (Stages of Language Acquisition)

ভাষা অর্জনের চারটি প্রধান স্তর বা ধাপ রয়েছে। এই স্তরগুলো প্রতিটি সক্ষম ভাষীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমেই ভাষী দৈহিক ও মানসিকভাবে ভাষা অর্জনে প্রস্তুতি লাভ করে এবং চুড়ান্তভাবে তার মাতৃভাষা বা প্রথমভাষা অর্জন করে থাকে। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু স্তর সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। অর্থাৎ একই প্রক্রিয়া অনুসারিত হতে পারে। ভাষা অর্জনের স্তরগুলো হল-

১) অস্ফুস্টস্বর স্তর (babbling stage)
২) একশব্দ স্তর (one-word stage)
৩) দ্বি শব্দস্তর (two-word stage)
৪) টেলিগ্রাফিক স্তর (Telegraphic stage)

ভাষা অর্জনের এসব স্তর বা ধাপ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১) অস্ফুটস্বর (Babbling)

জন্মের পর পরই অস্ফুটস্বর স্তর শুরু হয়। এই সময়কালকে কথা বলার প্রস্তুতি-পর্ব বলা যায়। এসময় শিশু কিছু শব্দ (Sound) করে আক্ষরিকভাবে যার কোন অর্থ নেই। এ সময় মূলত শিশুর স্বর-যন্ত্র (Vocal Cord) প্রস্তুত হয়। শিশু সাধারণত ১২ মাস বয়স থেকে পরিচিত শব্দগুলো বলতে পারে। তবে শারিরীক সমস্যাগ্রস্থ শিশুর ক্ষেত্রে এই স্তর স্বাভাবিক নাও হতে পারে। ভাষা অর্জনের প্রাথমিক এই স্তরে শিশু স্বর ও ব্যাঞ্জন দুধরনের ধ্বনিই উচ্চারণ করতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিশুর উচ্চারিত ব্যাঞ্জন ধ্বনিগুলো হল-- /p, b, t, d, k, g, m, n, s, h, w, j/ এবং মাঝে মাঝে কিছু ব্যতিক্রম ব্যঞ্জন যেমন-- /f, v, θ, ð, ʃ, tʃ, dʒ, l, r, ŋ/ উচ্চারণ করে থাকে। জন্ম থেকে ৮ মাসের মধ্যে শুরু হয় এই স্তরের সূচনা হয়। এবং ১২ মাস বয়স চলাকালীন সময়েও তাদের এই ধরণের ধ্বনি বেশি উচ্চারণ করতে দেখা যায় (different stages of language acquisition, 2017)।

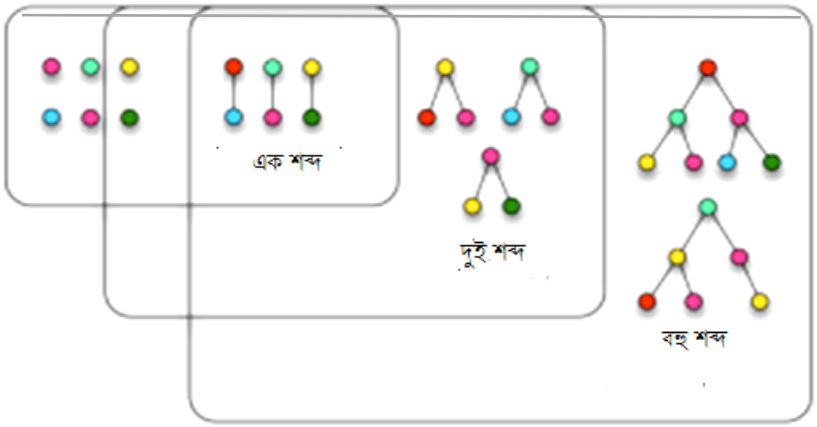

চিত্র: শিশুর ভাষা অর্জনের স্তর।

২) **একশব্দ স্তর** (One Word Stage)

একশব্দ স্তরে শিশু একটি করে শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। একে Holophrastic স্তর ও বলা হয়। এটি ভাষা অর্জনের দ্বিতীয় স্তর। শিশু এ সময় এক শব্দে বাক্যের মনোভাব প্রকাশ করে। একশব্দ স্তরে শিশুর শব্দ ভাণ্ডারের ৫০ ভাগ বিশেষ্য পদ থাকে। ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-ভাববিশেষক (modifiers) থাকে ৩০ ভাগ। বাকী অংশ জুড়ে প্রশ্নবোধক ও নাবোধক পদ থাকে। শিশুরা এসময় শব্দগুলো উচ্চারণ করে তাদের প্রয়োজন বা ইচ্ছা বোঝাতে। উদাহরণস্বরূপ বাংলা ভাষায় *যাই /jai/* শব্দটি দিয়ে শিশু এ স্তরে কোথাও যাওয়া ইচ্ছা প্রকাশ করে। *খেলা* /k^{h}ela/ শব্দ দিয়ে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

একশব্দ স্তরের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে শিশু দুইশব্দ স্তরে যেতে পারদর্শী হয়। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে আমরা পূর্ণ বয়স্ক ভাষীকেও একশব্দ স্তর ব্যবহার করতে দেখি। যেমন একজন বাংলা ভাষী যখন তার দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি প্রতিবেশে পানি খাব এটা বোঝাতে Water-*/oater/* বলে তখন সে তার দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের প্রাথমিক স্তরে থাকে।

৩) **দুইশব্দ স্তর** (Two Word Stage)

দুই শব্দ ব্যবহারের পর্যায়ে শিশু ২টি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। এর মধ্য একটি উদ্দেশ্য ও অপরটি বিধেয় হয়। যেমন বাংলা ভাষায় *বাবু খায় /abbu khay/, আম্মু যাই /ammu jai/* ইত্যাদি বাক্য। এ সময় থেকে শিশু কিছু কিছু প্রত্যয় ব্যবহার করতে শেখে। যেমন: *মনাকে দাও।/mɔnake d̪ao/* এখানে শব্দান্তে *-কে* প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

দুইশব্দ স্তর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। প্রথম ভাষা অর্জনে বয়স এর ভুমিকা প্রবল থাকলেও দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দ্বিতীয় ভাষী অনেক সময় সচেতন বা অবচেতনে এ

ধরণের পরিস্থিতিতে ব্যাকরণিক কাঠামো অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না। ইংরেজি ভাষার দ্বিতীয় ভাষীর ভাষা ব্যবহার এর মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা যায়।

You Dance = কাউকে নাচে আমন্ত্রন করা (সম্প্রসারিত অর্থ)।

No Have = কোন কিছু নেই (সম্প্রসারিত অর্থ)।

৪) **টেলিগ্রাফিক স্তর** (Telegraphic Stage)

শিশু ভাষা শেখার স্তরগুলোর মধ্যে চুরান্ত স্তর হল টেলিগ্রাফিক স্তর। বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি টেলিগ্রামের সাথে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায় বলে এরূপ নাম হয়েছে। এ পর্যায়ে অধিকাংশ বাক্যই তিন বা চার শব্দের হয়ে থাকে। এসময় শিশুর শব্দভাণ্ডার ৫০ থেকে ১৩০০০ পর্যন্ত শব্দ ধারণ করতে পারে। এ পর্যায় শেষে শিশু বহুবচন, যৌগিক শব্দ ও কালের সঠিক ব্যবহার শুরু করে। টেলিগ্রাফিক স্তরে শিশু প্রথম ভাষার ব্যাকরণিক উপাদানগুলোর ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারে না। যেমন: ইংরেজিতে--

Daddy here > Daddy is here.

Daddy home now > Daddy is at home now

বয়স সাধারণত দেড় থেকে ৩ বছরের মধ্যে ভাষা অর্জন ঘটে। ২ বছর বয়সে এই স্তর শুরু হয়। ৩ বা চার শব্দের বাক্য বলা শুরু করে।

উপরে আমাদের আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে প্রথম ভাষা অর্জনের স্তরগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সাথে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের স্তরকেও সংযুক্ত করে থাকে। তা উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পাঁচটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী জে. হাইনজ (Haynes, 2007)। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের সেই স্তরগুলো নিচে ছক আকারে উপস্থাপন করা হল।

ক্রম	স্তর	শব্দভাণ্ডার/সময়কাল	বৈশিষ্ট্য
১	পূর্ব-উদ্গম (Preproduction)	প্রায় ৫০০টি শব্দ	ভাষী এসময় দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার করে না।
২	প্রাথমিক- উদ্গম (Early Production)	প্রায় ১০০০টি শব্দ	ছোট বাক্য বা বাক্যাংশ বলা শুরু করে।
৩	ভাষা-নির্গম (Speech Emergence)	প্রায় ৩০০০টি শব্দ	ছোট বাক্যের মাধ্যমে কথোপকথন করতে পারে। অপর ভাষীকে প্রশ্ন করতে পারে। ছবির মাধ্যমে গল্প বললে বুঝতে পারে।
৪	মাধ্যমিক বাক-গতি (Intermadiate Fluency)	প্রায় ৬০০০টি শব্দ	ব্যাকরণিক কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বত্তেও ভাষী দীর্ঘ ও জটিল বাক্য বলতে ও বুঝতে সক্ষমতা অর্জন করে।
৫	উচ্চ বাক-গতি (Advance Fluency)	৫ থেকে ১০ বছর	ভাষাটি প্রায় প্রথম ভাষীর মতো ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

ছক: দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের স্তর

বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষীর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা (Bangla as Second Language to Santali Speaker in Bangladesh)

বাংলাদেশে সাঁওতালদের প্রধান বসতি দেশের উত্তরাঞ্চলে। সে অঞ্চলে সাঁওতালদের পাশাপাশি বাস করে আরো বেশ কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এদের ভাষায় রয়েছে ভিন্নতা। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেরও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা। এ ভাষাতেই সাঁওতাল ভাষী অঞ্চলগুলোতেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়। ফলে প্রধান দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উত্তরবঙ্গের সাঁওতালদের ভাষা বাংলা। তবে এছাড়াও অঞ্চলভেদে বাংলার পাশাপাশি সাঁওতালিরা আরও কিছু ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে সাদরি অন্যতম। এছাড়া মাহালে ও মালতো ভাষাতেও এদের সংজ্ঞাপন করতে দেখা যায়। আমাদের বর্তমান গবেষণায় সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে আমরা বাংলা ভাষাকে সাঁওতালি ভাষীদের প্রধান দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পেয়েছি। আর তাই এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে।

বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা জেনেছি আর্যদের আগমনের আগে ভারতবর্ষে বাস করত নানা অনার্য জাতি। ধারণা করা হয় খ্রিস্টের জন্মেরও দেড় থেকে দু হাজার বছর পূর্বে প্রথম এদেশে আর্যদের আগমন ঘটে। বিভিন্ন সময়ে এদেশে আসা আর্য, দ্রাবিড়, নিগ্রো, নেটিগ্রো, অস্ট্রিক, ভোট চীনীয়, আর্য-সেমেটিক, মঙ্গোলীয়দের মিশ্রণে বাঙালি নামের একটি সংকর জাতি সৃষ্টি হয় (সিকদার, পলি, ২০১৬)। সুভাষ ভট্টাচার্য মনে করে সংকর জাতি হলেও বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে আর্যদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি (২০০০)। তৎকালীন পারস্য অঞ্চলে বাস করত আর্যরা। এরা পশুপালক ও যাযাবর জাতি ছিল। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসে। আর্য মূলত একটি ভাষার নাম। আদি-আর্য হল বৈদিক ভাষার জননী। এই ভাষা ও ভাষায় রচিত সাহিত্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাদের ভাষায় দেব-বন্দনামূলক গীতিকাব্য রচিত হয়েছিল। আর্যরা তাদের নিজস্ব ভাষা নিয়ে ভারতবর্ষে আসার ফলে এদেশে হিন্দি, অহমিয়া, ওড়িয়া, বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হয়েছে (সিকদার, ২০০২)। বাংলা ভাষা আর্য প্রাভাবিত বলেই এই ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার অন্তর্গত। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ অনুসারে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে হাজার বছর পূর্বে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বাংলা ভাষার জন্ম ষষ্ট থেকে দশম শতকের। বাংলা ভাষা এর পরে বিকশিত হয়েছে নানা ভাবে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে কালজয়ী সাহিত্য।

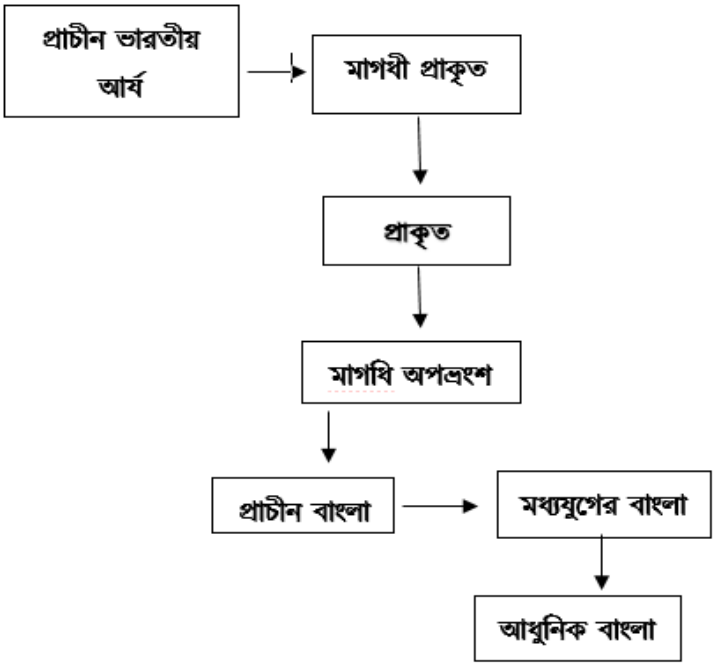

চিত্র: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুসারে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

এথনোলগের অনুসারে সারা বিশে বাংলা ভাষী ২৬১,৫১৭,৯৩০ জন। যার মধ্যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষী সংখ্যা ১৫৯০০০০০০ (২০১৫) জন। বাংলা ভাষা ভারত সংবিধানে তালিকাভুক্ত ২২টি ভাষার মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষা বিশ্বের সপ্তম শীর্ষ স্থানীয় ভাষা (সরকার ও হক, ২০১৫)। মাতৃভাষার অবস্থান বিচারে পঞ্চম। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপের পাশাপাশি অনেকগুলো উপভাষা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বাংলা উপভাষাগুলো হল সিলেটি, চাটগাইয়া ও বরিশালের উপভাষা ইত্যাদি। মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যানুসারে কিছু বিভাজন দেখিয়েছেন। তা এরকম-

ক) উত্তর বঙ্গীয়: দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা

খ) রাজবংশী: রংপুর

গ) পূর্ববঙ্গীয়: ১) ঢাকা, ময়মন সিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালি

২) ফরিদপুর, যশোর, খুলনা

৩) সিলেট

ঘ) দক্ষিণ বঙ্গীয়: চট্টগ্রাম, নোয়াখালি (চৌধুরী, ১৯৭৬)।

বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে যা ব্রাহ্মী লিপির কুটিল শাখা থেকে উদ্ভব হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি লিপি। বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি থেকে। তবে বর্তমান বাংলা লিপির যে রূপ আমরা পেয়েছি নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। সর্বশেষ লিখিত কাঠামোগত রূপ দেন চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকার। তারা ১৭৭৮ সালে পশ্চিম হুগলী জেলায় প্রাচীন পুঁথির বাংলা বর্ণের আদলে বাংলা বর্ণমালা তৈরি করে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকেই একই সালে নাথায়েল ব্রাসি হ্যালহেড কর্তৃক রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ A Grammar of the Bengali Language গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (ইসলাম, ২০১৫)।
বাংলা লিপির সংস্কার করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি এই লিপির আকৃতিগত স্থিরতা প্রদান করেন পাশাপাশি বাংলা যতিচিহ্নের প্রবর্তন করেন (সরকার ও হক, ২০১৫)।

এ ভাষার রয়েছে ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত হয়। দুটি অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিগত অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্য থাকার কারণে যুক্ত করা হয়। পাকিস্থান নামক রাষ্ট্র গঠন হবার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকরা উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা

হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। যার ফলে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী বিরুদ্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আন্দোলন করে সাধারণ বাংলা ভাষী ছাত্র জনতা। ফলে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রতিষ্ঠা হয় বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো তাদের ৩০ তম অধিবেশনে ২১শে ফ্রেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

তথ্যসূত্র

১. চৌধুরী, মুনীর।(১৯৭৬)। বাংলা গদ্যরীতি। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২. মহাম্মদ দানীউল হক। (২০০৭)। *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন প্রাথমিক ধারণা।* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩. মহাম্মদ দানীউল হক। (১৯৯৩)। *ভাষার কথা: ভাষাবিজ্ঞান।* ঢাকা: করিম বুক কর্পোরেশন।

৪. মুসা, মনসুর। (২০০০)। *প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা।* ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড।

৫. শ' রামেশ্বর। (২০০৪)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

৬. মোঃ শরিফুল ইসলাম। (২০১৫)। *বাংলা লিপি।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org/index.php?

সরকার, পবিত্র এবং হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০১৫) *বাংলা ভাষা।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org

৭. সিকদার, সৌরভ। (২০০২)। *ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা।* ঢাকা: অনন্যা।

৮. সিকদার, সৌরভ ও পলি, নাসিমা। (২০১৬)। *বাংলাদেশের ভাষা ও লিপি*। ঢাকা: অনন্যা।

৯. Catherine, j. doughty and Michael h. edt. (2003). *The Handbook of Second Language Acquisition*. Oxford: Blackwell publishing ltd.

১০. Cook, Vivian. 2002. *Portraits of the L2 User.* New York: Multilingual Matters Ltd.

১১. *Different Stages of Language Acquisition*. Retrieved from http://www.languagestudy.com/blog/different-stages-of-language-acquisition/pdf

১২. Gass, Susan M. and Selinker, Larry. (2008). *Second Language Acquisition.* UK: Routledge.
Second language. (2014). Retrieved from http://www.oxfordreference.com/

১৩. *Grammatical Development* (2017) retrieved from www.revisionworld.com

১৪. Krashen, Stephen. (1982). *Principle ans Practice in Second Language Acquisition.* California: Pergamon Press Inc.

১৫. Krashen, Stephen. (2013). *Second Language Acquisition Theory, Application and Some Conjecture.* Maxico: Cambridge University Press.

১৬. White, Lidia. (2003). *Second Language Acquisition and Universal Grammar*. Uk: Cambridge university press.

১৭. Muriel Saville-troike. (2006). *Introducing Second Language Acquisition.* Cambridge: Cambridge University press.

১৮. Richards, jack and others. (1985). *Longman Dictionary of Applied Linguistics.* UK: Longman group limited.

১৯. *Second Language.* Retrieved from http://www.ldoceonline.com/dictionary/second-language

২০. Second Language. (n.d.) *Random House Kernerman Webster's College Dictionary*. (2010). Retrieved from July 9 2017 from http://www.thefreedictionary.com/second+language

২১. Retrieved from http://education.cu-portland.edu/blog/news/five-stages-of-second-language-acquisition/

সপ্তম অধ্যায়

সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: উপাত্ত বিশ্লেষণ

গবেষণার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহের পর যে স্তরটি অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হল উপাত্ত বিশ্লেষণ। এটি একইসাথে একটি মৌলিক ও সৃজনশীল পর্যায়, যার মাধ্যমে মাঠ থেকে সংগৃহীত উপাত্তগুলো অনুপুঙ্খ অধ্যায়নের মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নেসমূহের উত্তর খুঁজে বের করে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রধানত দুটি উপায়ে করা হয়।

ক) উপাত্তের গুণগত বিশ্লেষণ

খ) উপাত্তের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

আমরা বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের প্রাপ্ত উপাত্তের গুণগত বিশ্লেষণ করেছি এবং তথ্য উপস্থাপনের কৌশল হিসেবে সাধারণ বর্ণনার পাশাপাশি সারণি ও পরিসংখ্যানিক লেখচিত্রের ব্যবহার করেছি।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আমাদের গবেষণা উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বেশ কিছু কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এর মধ্যে উল্লেখ্য সাক্ষাৎকার কৌশল, যার মধ্যে কাঠামোগত (অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের সাহায্য) ও কাঠামোহীন (প্রশ্নপত্র ছাড়া) সাক্ষাৎকার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া নিবিড় দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমেও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় কাঠামোগত অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের সাহায্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় সাঁওতালি ভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শহর ও গ্রাম অবস্থান-ভিত্তিক প্রদেয় উপাত্তের তারতম্য রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের দেয়া উপাত্তে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের প্রাপ্ত উপাত্তগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি।

ক) শহরের উপাত্ত এবং

খ) গ্রামের উপাত্ত

মাঠ থেকে গৃহীত আমাদের মোট ২০টি প্রশ্নপত্রের মধ্যে ৭টি প্রশ্নপত্রের উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে শহরাঞ্চল থেকে বাকী ১৩টি প্রশ্নপত্রের উপাত্ত নেয়া হয়েছে গ্রামাঞ্চল থেকে। সে হিসেবে আমাদের উপাত্তের গ্রামীণ ও শহরের অনুপাত ৬৫: ৩৫। উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা গ্রাম ও শহরের উপাত্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোয় বিশ্লেষণ করব। পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চগুলো কিভাবে সক্রিয় তার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণও উপস্থাপন করা হবে।

সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
(Sociolinguistic Analysis)

মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে সাঁওতালি ভাষা ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়াদি উপস্থাপিত হলেও বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপাত্ত বিশ্লেষণে আমরা প্রধাণত আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেছি। সেদিক থেকে সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা অর্জন বিভিন্ন সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে শিশুর ব্যবহৃত ভাষা সংখ্যা, ভাষিক দক্ষতা, সমাজে শ্রেণিভেদে ভাষার ব্যবহার, সামাজিক প্রতিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইত্যাদির সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চগুলো এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। নিম্নে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন এর সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হল।

ক) দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা (Bilingualism and Multilingualism)

সাঁওতাল ভাষী শিশুদের মধ্যে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা উভয়ই দেখা যায়। তবে এখানে উল্লেখ্য যে গ্রাম আর শহরের ভাষীদের মধ্যে এই দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতার পার্থক্য দেখা যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমাদের জানান তাদের বিদ্যালয়ে একই সাথে নানা সম্প্রদায়ের শিশু আসে। তাদের ভাষাতে রয়েছে ভিন্নতা। এর মধ্যে বাঙালি, সাঁওতাল, ওঁরাও এর পাশাপাশি মালতো ভাষী পাহারিয়া সম্প্রদায়ের শিশুরাও আসে। ফলে শিশুদের মধ্যে দৈনন্দিন কথোপকথনের মাধ্যমে এক শিশু অন্য শিশুর ভাষা শিখে থাকে। তবে সাঁওতালি শিশুর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেই সাধারণ যোগাযোগের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শিখে থাকে। এই চিত্র শহরের সাঁওতালি পরিবারগুলোতে বেশি দেখা যায়। চার্চের প্রভাব, পাশাপাশি বসবাসকারী অন্য আদিবাসী ও বাঙালি সমাজের সাথে যোগাযোগ এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ্রামে সাঁওতাল গ্রামগুলো বাঙালি গ্রাম থেকে পৃথক (Isolated) হওয়ায় বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বে তাদের বাংলা বা অন্য ভাষা শেখার সুযোগ প্রায় থাকে না। ফলে বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বে কোন কোন গ্রামীন সাঁওতালি শিশু বাংলা সামান্য বুঝতে পারলেও বলতে পারে না। তাদের যখন প্রশ্ন করা হয় বাংলা ভাষা তুমি কি ভাবে বুঝতে পার? তখন জানা যায় গণমাধ্যম এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এমনকি বাংলাদেশের বাঙালিদের মত তাদের অনেকে গণমাধ্যমের প্রভাবে পাশ্ববর্তী দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি বুঝতে ও বলতে পারে।

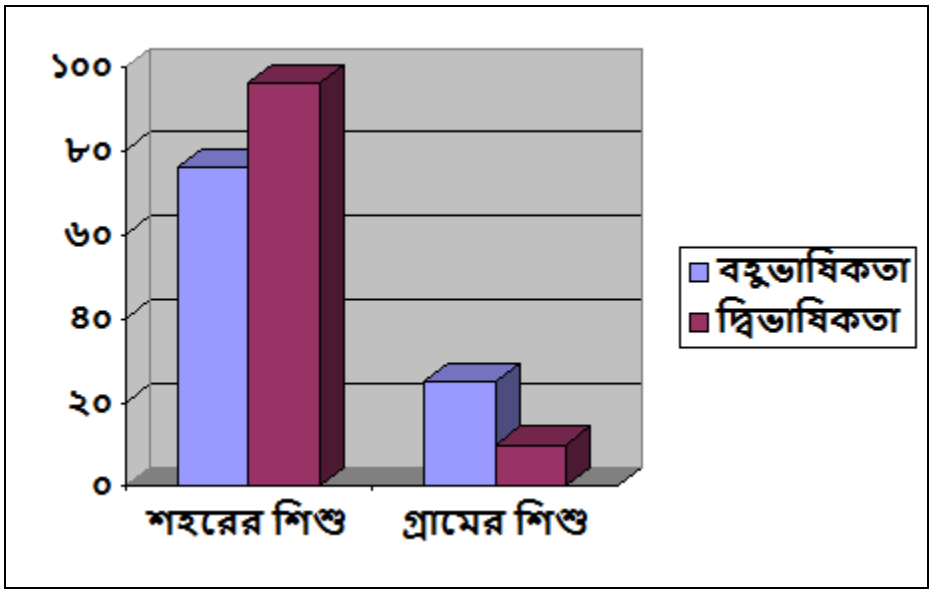

লেখচিত্র: সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতার তুলনামূলক অবস্থান

উপরের লেখচিত্রটিতে বাংলাদেশের সাঁওতালি ভাষী শিশু দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতার একটি তুলনামূলক অবস্থান উপস্থাপন করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষী শিশুদের প্রদেয় তথযানুযায়ী শহরের প্রায় ৭৬ শতাংশ শিশু বহুভাষিক। অর্থাৎ তারা মাতৃভাষা ছাড়াও আরো কমপক্ষে ২টি ভাষা জানে বলে আমাদের জানিয়েছে। অন্যদিকে গ্রামের শিশুদের মধ্যে বহুভাষিকতা নেই বললেই চলে। তবে কেউ কেউ জানিয়েছে তারা মাতৃভাষা ও বাংলার পাশাপাশি অন্য আরেকটি ভাষা জানে। দ্বিভাষিকতার ক্ষেত্রেও গ্রামের সাঁওতালি ভাষী শিশুরা পিছিয়ে প্রাপ্ত উপাত্তে তাদের মধ্যে কেবল ২৫ ভাগ শিশু মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা বলতে পারে।

খ) মাতৃভাষায় দক্ষতা (Competancy in First Language)

সাঁওতালি শিশুর মাতৃভাষায় দক্ষতা কেমন তা জানার ক্ষেত্রেও আমরা দুটি প্রধান বিভেদ দেখতে পাই গ্রামের ও শহরের শিশুদের মধ্যে। বয়স অনুসারে তুলনামূলকভাবে গ্রামের শিশুরা সাঁওতালি ভাষা পূর্বেই শেখে। মাতৃভাষায় গান, ছড়াতেও তারা পারদর্শী। অপরদিকে শহরে বাড়িতে বাংলা ভাষাই অধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়ায়, এবং বাংলা ভাষার উপকরণের ব্যবহার বেশি থাকায় দেখা গেছে শিশুরা অর্ধভাষী বা ধীরে ধীরে একটা নির্ধারিত বয়সের পর মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করছে।

ক্ষেত্র	গ্রামের সাঁওতালি ভাষী শিশু	শহরের সাঁওতালি ভাষী শিশু
গান	পারদর্শী	পারদর্শী নয়
ছড়া	পারদর্শী	পারদর্শী নয়
সঠিক বাক্যগঠনের সক্ষমতা	পারদর্শী	সন্তোষজনক নয়
সমশব্দের ব্যবহার	সক্ষম	সক্ষম নয়

ছক: মাতৃভাষায় দক্ষতা।

উপরের ছক থেকে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের ভাষিক দক্ষতার নানা অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বাংলা প্রাভাবিত শহরাঞ্চলে সাঁওতালি ভাষী শিশুর ক্ষেত্রে ফলাফল ইতিবাচক নয়। অপরদিকে গ্রামের সাঁওতালি ভাষী শিশুর মাতৃভাষার ওপর দক্ষতা স্বাভাবিক ও ইতিবাচক। এ থেকে বলা যায় শিশুর ভাষিক প্রতিবেশ সহায়ক হলে সে দ্রুত মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয়।

গ) সামাজিক শ্রেণি (Social Class)

সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হচ্ছে সামাজিক শ্রেণি। সামাজিক শ্রেণি অনেক সময় ভাষা ব্যবহারকে প্রভাবিত করে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করে সাঁওতালদের মধ্যেও এধরণের শ্রেণিবিভাগ দৃশ্যমান হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা সমাজভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবভের (মৃণাল নাথ, ১৯৯৯) সামাজিক শ্রেণিকরণে ব্যবহৃত চলকগুলোর (variable) প্রয়োগ করতে পারি। চলকগুলো হলো শিক্ষা, আয় ও বয়স। সাঁওতালি সমাজব্যবস্থার বাস্তবতায় আমরা তাদের মধ্যে ৩ ধরনের সামাজিক শ্রেণি খুঁজে পাই। এগুলো হল-

১) নিম্নবৃত্ত
২) মধ্য নিম্নবৃত্ত
৩) নিম্ন মধ্যবৃত্ত

অধিকাংশ সাঁওতালি নিম্নবৃত্তের মধ্য মাতৃভাষার সচেতনতা নেই তবে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামে বসবাস করায় তাদের ভাষাগত অবস্থান শক্ত। এদের মধ্যে রয়েছে ভূমিহীন কৃষক, মজুর শ্রেণি ইত্যাদি। মধ্য নিম্নবৃত্তের মধ্যেও

ভাষাগত সচেতনতা নেই এবং তাদের মধ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার ব্যাপক। এ শ্রেণির মানুষ শহরাঞ্চলে দেখা যায়। এদের আয়ের উৎস চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি। মধ্য নিম্নবৃত্তের মধ্যে অর্ধভাষী সাঁওতালও দেখা যায়। নিম্ন মধ্যবৃত্ত সমাজে সাঁওতালি ভাষা সচেতনতা রয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের কথিত সাঁওতালি ভাষায় বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রণ ঘটলেও তারা অনেক ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে সাঁওতালি ভাষা প্রয়োগে সচেষ্ট থাকে। নিচের ছকটি শ্রেণিভেদে সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর ভাষিক অবস্থানের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করবে।

সামাজিক শ্রেণি	মাতৃভাষা সচেতনতা	মাতৃভাষার ব্যবহারে সঠিকতা	মাতৃভাষায় মিশ্রণ	দ্বিতীয় ভাষায় সাবলীলতা
নিম্নবৃত্ত	নেই	আছে	প্রায় নেই	প্রায় নেই
উচ্চ নিম্নবৃত্ত	নেই	নেই	বাংলা, ইংরেজি, সাদরি	কিছুটা বিদ্যমান
নিম্ন উচ্চবৃত্ত	স্বল্প বিদ্যমান	নেই	বাংলা, ইংরেজি	আছে

ছক: শ্রেণিভেদে সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর ভাষিক অবস্থান

উল্লেখ্য ছকের তথ্য পর্যবেক্ষণ ও অকাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা গবেষকের[১] সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ঘ) বুলিসরণ (Code Shifting)

আমরা ভাষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বুঝতে পারি যে পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলোতে ভাষী কর্তৃক ভাষা মিশ্রণ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ভাষা মিশ্রণের এই প্রক্রিয়াটিই সমাজভাষাবিজ্ঞানে বুলিসরণ নামে পরিচিত। সহজ ভাষায় কোন একজন ভাষী যখন মাতৃভাষায় কথা বলার সময় অন্য আরেকটি বা একাধিক ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করে তখন তাকে বুলি সরণ বলা যায়। বুলি সরণ বাক্যিক কিংবা শাব্দিক স্তরে হতে পারে। সাধারণত যেসব ভাষিক অঞ্চলে দ্বিভাষা বা বহুভাষিকতা প্রচলিত রয়েছে সেখানে বুলিসরণের ব্যাপক উদাহরণ পাওয়া যায়। বুলিসরণের ক্ষেত্রে ভাষীর ভাষিক ক্ষমতা, ইচ্ছা, সামাজিক প্রতিবেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের গবেষণায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, সাঁওতালি ভাষীদের মধ্যে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারে বুলিসরণের ব্যপকতা লক্ষণীয়। বিশেষত শাব্দিক স্তরে আধুনিক ধারণার যৌগিক শব্দগুলোতে ইংরেজিরও মিশ্রণ দেখা যায়।

যেমন: রেলপথ – /rel hɔr / {রেল হর}

বাংলার ক্ষেত্রে, মোটর গাড়ি – /motɔr gãri/ {মোটর গাঁড়ি}

বাক্যিক স্তরে সাঁওতালি ভাষীর বুলিসরণের এধরণের উদাহরণ নিম্নরূপ-

আজ কয় তারিখ= / tehin tĩna? tarikh/ {তেহিঞ তিনাঃ তারিখ?}

আমি স্কুলে যাই = / ĩndo iskulin cala?a/ {ইঞদো স্কুলিঞ চালাঃ আ।}

এই রিক্সা যাবেন?= / ãi riksam cala?a/ {আঁই রিক্সাম চালাঃ আ?}

উপরের উদাহরণগুলোয় দেখা যাচ্ছে যৌগিক শব্দ গঠনে ও বাক্যিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষীরা বুলিসরণ করে থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যয় যুক্তকরণের মাধ্যমেও বুলিসরণ হয়।

যেমন: /riksam/ = /riksa/+/m/ {রিক্সায়}

এখানে /riksa/ রূপমূলটি বাংলা ভাষা থেকে নেয়া এবং /m/ প্রত্যয়টি সাঁওতালি ভাষা থেকে এসেছে।

সমাজভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বুলিসরণ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা দূষণ ও ভাষা সরণের পেছনে শক্তিশালী কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন বুলিসরণকে। প্রসঙ্গক্রমে বুলিসরণের সাথে ভাষা সরণের সংযোগটি আমরা নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারি।

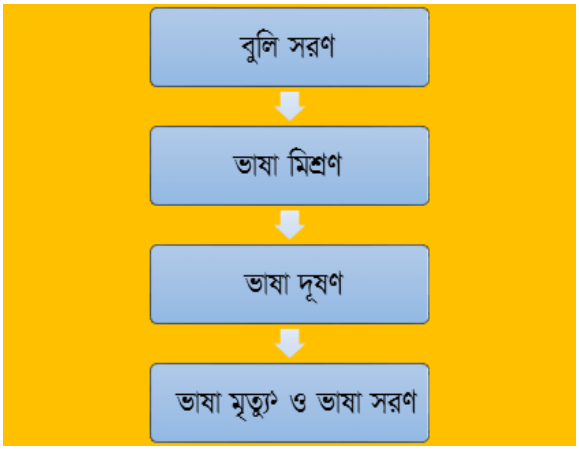

চিত্র: বুলি সরণ ও ভাষা সরণের মধ্যে সংযোগ।

এখানে (চিত্রে) ভাষা সরণের কারণ হিসেবে বুলি সরণকে দেখানো হয়েছে এবং বুলি সরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে ভাষা সরণ ঘটতে পারে তার ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষীদের মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদিও বুলিসরণ তেমন বিশেষ স্থান দখল করতে পারে নি। তবে সময়ের সাথে এই প্রক্রিয়াটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

ঙ) ধর্ম (Religion)

সাঁওতালি সমাজে ধর্ম ভাষা প্রয়োগ-বিধিতে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যেভারতীয় উপমহাদেশে সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবেশ হয়েছে ঔপনেবেশিক কাল থেকে। তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে এর সময় কালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তৎ-পরবর্তীকাল হতে ধীরে ধীরে সাঁওতাল সমাজে ও ভাষায় খ্রিস্ট ধর্মের বিচিত্র উপাদানের সংযোজন ঘটেছে। এর মধ্যে স্পষ্ট ভাবে সাঁওতালি নামকরণে ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায়। যেমন:

রঘু অগাস্টিন সরেন / roghu ɔgastin sɔren/

রামকানাই মুরমু /ram kanai murmu/

এখানে নামের মাধ্যমেই সাঁওতালি মানুষটির ধর্মীয় পরিচয় চিহ্নিত করা সম্ভব।

এছাড়া সনাতন ধর্মের নানা উপাদানও তাদের ভাষায় বিদ্যমান। যেমন:

{রংধনু}- রাম লক্ষণাঃ আডি /ram lakk^{h}anaʔ adi/

মিশনারীদের প্রাভাবিত হয়ে ইংরেজি ভাষার বেশ কিছু ধর্মীয় শব্দ বা তার বাংলা অনুদিত শব্দ তাদের মধ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন ফাদার, মাতা মেরী, চার্চ, বড়দিন, উৎসব, ঈশ্বর প্রভৃতি। একই ধর্মের অন্য জাতির সাথে বিয়েও সাঁওতাল সমাজে বিদ্যমান। বিশেষত শহরের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায়।

চ) শিক্ষকের মনোভাব (Teachers Attitude)

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষীর বিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ভাষীর পাঠ মাধ্যম হিসেবেও যখন তার দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় ভাষা শিখন ও অর্জনে বিদ্যালয়ে সাঁওতালি শিশুর প্রতিক্রিয়া কেমন, তা জানতে আমরা বেশ কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার গ্রহন করি। সাঁওতাল

আদিবাসী অধ্যুষিত এসব অঞ্চলে শিক্ষকদের বহুভাষী ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শ্রেণি পরিচালনা করতে হয়। এসব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে বাংলা, সাদরি, সাঁওতালি, মালতো ভাষী শিশু।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করেন মার্তৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই সাঁওতালি ভাষী শিশুদের জন্য ভাল ফল বয়ে আনবে। তবে তারা আশংকা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে যখন এই ভাষা প্রয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে তখন তারা মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। তারা আরও জানান উচ্চশিক্ষার জন্য সাঁওতালি ভাষা প্রযোজ্য না হওয়া অভিভাবকদের মধ্যেও বিদ্যালয়ে এই ভাষার মাধ্যমে পাঠদানের ক্ষেত্রে তেমন একটা উৎসাহ নেই। সাঁওতালি ভাষী শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তাদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলায় প্রাথমিক কিছু জ্ঞান থাকে। তারা প্রথম দিকে গ্রামের বিদ্যালয়ের সাঁওতালি ভাষী শিশুরা বাংলা বুঝতে পারে তবে বলতে পারে না, অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের সাইলেন্ট মুড পর্যায়ে থাকে। যদিও বাংলাদেশে এ ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানে কোন পদ্ধতির ব্যবহার হয় না। কিন্তু ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের শিশুরা তাদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা আয়ত্ত করে। ৮ বছর বয়সের মধ্যে সাঁওতালি ভাষী শিশুরা তাদের দ্বিতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। তবে শহরের বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা বুঝতে ও বলতে সাঁওতালি ভাষী শিশুর কোনো সমস্যা হয় না। কেননা তারা বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথপোকথনে অভ্যস্ত থাকে। কোনো কোনো শিক্ষকদের অভিমত ভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিয়ে হওয়ার কারণে অনেকসময় সাঁওতালি ভাষায় তার প্রভাব পড়ছে। তারা আশংকা করেন যে কয়েক প্রজন্ম পর বাংলাই সাঁওতালদের মূল ভাষায় পরিণত হবে।

বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষায় পূর্বে বাঙালি শিশু সাঁওতালি শিশুকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করলেও এখন তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। যেমন কোনো সাঁওতালি শিশু বাংলা কোনো শব্দ উচ্চারণে অসর্থ হলে বাঙালি সহপাঠি তাকে উচ্চারণে সহায়তা করে।

শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার থেকে আমরা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের বেশ কিছু সমস্যার দিক চিহ্নিত করতে পারি। এগুলো হল-

১) বাংলা ভাষা উচ্চারণে সমস্যা
২) বিদ্যালয়ে অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য ভাষার ভাষী শিক্ষক থাকা
৩) দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি শিশুর অস্বস্তি বোধ হওয়া
৪) ভাষা প্রতিবন্ধকতার জন্য বাঙালি শিক্ষার্থীদের চেয়ে লেখা-পড়ায় পিছিয়ে পড়া
৫) বহুভাষী শ্রেণিকক্ষ থাকা
৬) সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিতীয় ভাষা চর্চা ও শুদ্ধভাবে বলার আগ্রহ না থাকা

ছ) অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গি (Parents Views)

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের মূল লক্ষ্য শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ থেকে ১২। তবে এর চেয়েও ছোট শিশুদের ক্ষেত্রেও আমরা অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আলোকে মাতৃভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছক আকারে বিশ্লেষণ করা হল।

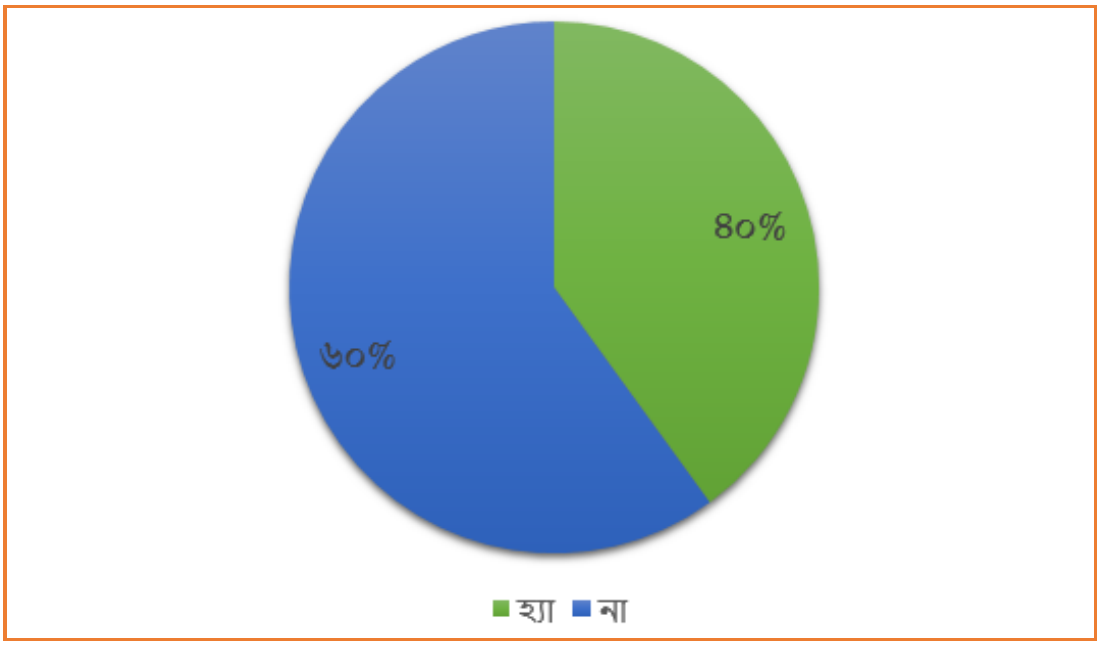

পাই-ছক: অভিভাবকের দৃষ্টিতে সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতার হার।

উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বাবা মা তাদের শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা এর দক্ষতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাতে দেখা যায় যে ৬০ ভাগ বাবা মা মনে করেন তাদের সন্তান দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষ। এবং ৪০ ভাগ বাবা মা মনে করে তাদের শিশুরা দ্বিতীয় ভাষায় সংজ্ঞাপনে পুরোপুরি দক্ষ নয়।

অনেকে মন্তব্য করেন তাদের শিশু পরিবার ও সমাজ থেকে এ দ্বিতীয় ভাষা শিখেছে। সামাজিক প্রয়োজনই এ ভাষা শেখার মূল কারণ। অন্যথায় তারা চায় তাদের শিশু শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করুক। তাদের মধ্যে অনেকে পরিস্থিতি অনুসারে বাংলাদেশে শিক্ষিত শ্রেণির দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি শেখাতে আগ্রহী।

জ) দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে বয়স ও লিঙ্গ (Age and Gender in Language Acquisition)

একই সামাজিক শ্রেণির মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যে ভাষা অর্জনের সক্ষমতা ও ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে নারী দক্ষতা বেশি (Schiller edt., 2015)। প্রবন্ধকার এ্যান ম্যারিট একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কথা উল্লেখ করে জানান ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের মস্তিষ্কের কার্য ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে বেশি (Merritt, 2014)। সাঁওতালি ভাষার তথ্যদাতাদের সাথে এই মতটির সামাঞ্জস্য খুঁজে পাই আমরা।

আমাদের গবেষণার উপাত্ত অনুসারে জানা যায়, দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে নারী শিশুরা দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। তবে বরাবরের মতই শহরের শিশুরা এক্ষেত্রে এগিয়ে। সাঁওতালি মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুর চেয়ে দ্রুত দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করে বলে জানিয়েছেন তাদের অভিভাবকরা। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দুটি বিষয়- ১) মনোযোগ ও ২) আগ্রহ।

বয়স অনুসারে শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জন দক্ষতার ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ৫ বছর বয়সেই তারা বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে। যদিও অধিকাংশ অভিভাবকের মতে ৩ বছর বয়সের মধ্যেই তাদের শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারে। অবশ্য শিক্ষকদের মতে, গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে যেসব সাঁওতালি ভাষী শিশুরা আসে তারা ৮ বছরের পূর্বে ভাল করে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা বলতে পারে না।

বয়স	**৩ বছর**	**৪ বছর**	**৫ বছর**	**৬ বছর**	**৭ বছর**
অভিভাবকের উত্তর	৭ জন	৪ জন	৪ জন	২ জন	৩ জন
মোট ২০ জন					

ছক: বয়স অনুসারে ভাষা অর্জনের দক্ষতা

উপরের ছকে অভিভাবকের উত্তর বিশ্লেষনে দেখা যায় উত্তরদাতাদের অধিকাংশই মনে করেন সাঁওতালি শিশুরা ৩ বছর বয়সেই দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে। তবে শিক্ষকদের মতামত অনুসারে এরা ৭ থেকে ৮ বছর বয়সে ভাল দক্ষতা অর্জন করে থাকে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
(Linguistic Analysis)

আমাদের গবেষণাটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হলেও দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি একটি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘমেয়াদি মনোভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। আমাদের লক্ষ্য ভাষী সাঁওতাল হওয়ায় স্বল্পসময়ে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ভাষাতাত্ত্বিক ধাপগুলো অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সংগৃহীত উপাত্তের মাধ্যমে সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে মৌলিক ভাষাবিজ্ঞানে চারটি অংশের মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। অর্থতাত্ত্বিক আলোচনা এখানে সংযুক্ত করা হয়নি।

ধ্বনিতত্ত্ব
(Phonology)

আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার (Use of Nasal Vowel)

সাঁওতালি ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৮টি এবং যার মধ্যে ৬টির নাসিক্য। গ্রিয়ারসনের (Grierson, 1906) মতে এই ৮টি স্বরধ্বনিই দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব হতে পারে। বাংলা ভাষার সাথে এই ভাষার ধ্বনিগত পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ায় এই ভাষার স্বরধ্বনির কিছু সরাসরি প্রভাব তাদের দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বাংলা শব্দ উচ্চারণে নাসিক্য স্বরের ব্যবহার, দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার করে থাকে যা বাংলা ভাষায় নেই। ফলে সাঁওতালিদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় উচ্চারণ ভিন্নতা স্পষ্ট। এখানে তার কিছু নমুনা দেয়া হল।

চেঁপে / $c^{\tilde{h}}$epe/

করিঁনি /korĩni/

উপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, সাঁওতালি আনুনাসিক স্বর /- ẽ/ /- ĩ/ বাংলা শব্দ প্রয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাঁওতালি ভাষীদের জন্য দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এর মাধ্যমে সাঁওতালিদের বাংলা ভাষা ব্যবহারে স্বতন্ত্র উচ্চারণ-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

ধ্বনি পরিবর্তন (phonological Analysis)

যে কোনো ভাষায় ভাষী কর্তৃক ধ্বনি পরিবর্তন একটি অনিবার্য ঘটনা। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সাঁওতালি ভাষী শিশুরা যখন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তখন তার মধ্যে তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি ভাষার স্পষ্ট কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নির্ধারিত গবেষণা এলাকার আঞ্চলিকতার প্রভাব ছাড়াও সাঁওতালি ভাষারও বিশেষ প্রভাব আমরা দেখতে পাই। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের সব প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল। সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা শেখা বা অর্জনের ক্ষেত্রে তার মাতৃভাষার প্রভাবে বাংলা শব্দ উচ্চারণে যে ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে এই বিশ্লেষণ থেকে তা স্পষ্ট হবে।

সমীভবন

রূপমূলের একটি ধ্বনি পার্শ্ববর্তী আরেকটি ধ্বনির প্রভাবে রূপান্তর লাভ করলে তাকে সমীভন বলা হয়। ব্যঞ্জন ধ্বনিগত পরিবর্তন সমীভবন সাধারণত তিন ধরণের হয়ে থাকে। ক) প্রগত সমীভবন, খ) পরাগত সমীভন এবং গ) পারস্পরিক সমীভবন। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের মধ্যে সমীভবন প্রবণতা দেখা যায়। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ-

পাচ্চি -/pacci/ {পারছি}- প্রগত সমীভবন

যাইচ্চে-/jaicce/ {যাচ্ছে}

কব্বো-/kɔbbo/ {করব}

দন-/ d̪ɔn/ {ধন} – পরাগত সমীভবন

দোছা-/ d̪ɒʃa/ {দশা}- পারস্পরিক সমীভবন

বিষমীভবন

যখন দুটি অভিন্ন বা একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি ধ্বনি মধ্য একটি বদলে যায়, তখন তাকে বিষমীভবন বলে। এধরনের কিছু উদাহরণ সাঁওতালি ভাষী শিশুদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে। যেমন:

লিয়ে /liye/ {নিয়ে}

লেই /lei/{নেই}

ছমচ্যা / c^hmocca/{সমস্যা}

স্বরাগম

রূপমূলের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে অনেক সময় উচ্চারণের অসুবিধা হয় বলে তা দূর করার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে অতিরিক্ত একটা স্বরধ্বনি ব্যবহার করা হয়। স্বরধ্বনির অন্তভুক্তির ফলে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি দিয়ে শুরু হলে প্রায়ই রূপমূলের প্রথমে একটা স্বর ধ্বনির আগমন হয়ে থাকে। এই শ্রেণির অতিরিক্ত স্বরধ্বনি রূপমূলের প্রথমে অন্তর্ভূক্ত হলে তাকে স্বরাগম বলা হয়। সাঁওতালি শিশুদের বাংলা ভাষা ব্যবহার ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু উদাহরণ হল-

ইস্কুল-/iskul/ {স্কুল}
ইরম- /irɔm/ {এরকম}
ফিরত-/firɔt/{ফেরত}
ক্যানে -/kæne/ {কেন}
বোন্দো /bondo̯/ {বন্ধ}

অপিনিহিতি

সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপিনিহিতি প্রক্রিয়ায় ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণত পরের ই-কার বা উ-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলা হয়। সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারে এ ধরনের উদাহরণ হল-

বইল্লো- /boillo/ {বলল}

আইঁজ- /aĩ ɟ / {আজ}

জাইচ্চে-/ ɟaicce/ { যাচ্ছে}

জইন্য-/ ɟoinno/ { জন্য}

স্বরসঙ্গতি

উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। সাঁওতালি শিশুদের মধ্যে বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরসঙ্গতির উদাহরণ বিরল নয়। যেমন:

জাতি-/ ɟati/ {যাতে}

সিদেন-/sid̪en/ {সেদিন}

ফির-/fir/ {ফের}

ব্যঞ্জন-লোপ

শব্দের মধ্যে অবস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনি যখন লোপ পায় তখন তাকে ব্যঞ্জন লোপ বলে। সাঁওতালি শিশুর ব্যঞ্জন লোপের উদাহরণ খুবই কম। যেমন:

জাগা-/ ɟaga/ { জায়গা}

ব্যঞ্জনদ্বিত

কোনো শব্দে জোর দেবার জন্য যখন বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত দেয়া হয় তখন মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। একেই ব্যঞ্জন দ্বিত্ব বলা হয়। সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারে এ ধরনের প্রবণতা রয়েছে। যেমন:

বদ্দি-/bɔd̪d̪i/ {বড় দিদি}

পাচ্চি-/pacci/ {পারছি}

রূপতত্ত্ব

(Mrphology)

শব্দগঠন (Word Formation)

সাঁওতালি ভাষীদের শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় আমরা বেশ কিছু বিষয়ে ভিন্নতা লক্ষ্য করেছি। একই সাথে দুটি ভাষা ব্যবহার করা এবং সামাজিক নতুন ধারণার সাথে নিজ ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে শব্দের অভাব থাকায় সাঁওতালি ভাষীদের দুটি ভাষার মিশ্রণে শব্দ তৈরির প্রবণতা দেখা গেছে। নিচে কিছু উদাহরণ দেখানো হলো।

যৌগিক শব্দ-- মুক্ত রূপমূল + বদ্ধ রূপমূল (বাং + সাঁও) =

গোলগিয়া /gol + gia/> golgia {গোলাকার}

জাঁদু+উদুইচ / ɟad̪u+ ud̪uic/ {জাদুকর}

এখানে গোল/ -gol /রূপমূলটি বাংলা থেকে গৃহীত এবং গিয়া /- gia/ বদ্ধ রূপমূলটি সাঁওতালি শব্দ ভান্ডার থেকে গৃহীত। এরকম আরো যৌগিক শব্দ হল-

মুক্ত রূপমূল + মুক্ত রূপমূল (বাং + সাঁও) =

থুগিডি (ʈ̪ʰu̪ +gidi)= {থু ফেলা}

মুক্ত রূপমূল+ মুক্ত রূপমূল (সাঁও +বাং) =

/herem + alu/ {মিষ্টি আলু}

/maɽan+ montri/ মারাং +মন্ত্রী {প্রধানমন্ত্রী}

এছাড়া বাংলা ভাষা আত্তীকৃত বিদেশি কিছু শব্দ মাধ্যমে যৌগিক শব্দ গঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-

রেল হর=/ rel+ hɔr/ {রেলপথ}

সর্বনাম (Pronoun)

বাংলা ভাষা যখন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সাঁওতালি শিশুরা ব্যবহার করে তখন তাদের সর্বনাম প্রয়োগে সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে। এমন কি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে বড়দের মধ্যেও এই সমস্যা বিদ্যমান। এর প্রধান কারণ সম্ভবত সাঁওতালি ভাষায় আপনি অর্থবোধক সর্বনাম পদটি না থাকা।
সর্বনামের সাথে বাংলা বাক্যে যে ক্রিয়ার পরিবর্তন সেটির ক্ষেত্রে সাঁওতালি শিশুদের সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় সর্বনাম পদটি উহ্য থাকে। যেমন:

তু' কোথা যাইবি? / ʈu koʈʰa jaibi/

আবার সম্মান সূচক আপনি অর্থে তুই বা তুমি পদের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

বাবু তুই ভাল আছিস? / babu ʈui valo acʰis/

ক্রিয়া পদের ব্যবহার (Use of Verb)

বাংলা বাক্যে ক্রিয়া পদের ব্যবহারে সাঁওতালি শিশুদের মধ্যে সমস্যা লক্ষণীয়। বিশেষ করে এ কারণে তাদের বাক্য বলার ধরণ ধীরগতির হয়। কাল পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রিয়া পদের ব্যবহারে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলিক্ষিত হয়।

যেমন: jai/ jabo/ jeyeci/ jeyecilam/
{যাই- যাব – যেয়েছি – যেয়েছিলাম}

এছাড়া ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমেও বিশেষ ধরণের ক্রিয়া পরিবর্তন দেখা যায়।

যেমন:/kɔrbo- kɔbbo – kɔbbe/

{করব- কব্বো- কব্বে}

করছি- কচ্চি /korci-kocci/

আপনি এসব খাবে? /apni esɔb kʰabe/

তিনি কইতে লাগল / t̪ini koit̪e laglo/

শব্দ অর্জন দক্ষতার তুলনা (Comparison of Vocabulary Acquisition)

প্রশ্নপত্রে মাধ্যমে কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি শিখনের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য আমরা ৫৬ শব্দের একটি তালিকায় কিছু সাঁওতালি শব্দের বাংলা অর্থ পরীক্ষন করেছি। যা শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের অগ্রগতিকে নির্দেশ করে। আমরা বিভিন্ন বয়সী শিশুর মাধ্যমে শব্দ পরীক্ষা করেছি। অর্থাৎ মাতৃভাষায় তার শব্দটি বলা হলে সে বাংলায় তার প্রতিশব্দ বলতে পারছে কিনা তার একটি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায় ৫ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশুরা ৫৬টি শব্দের মধ্যে ১৫ থেকে ৩৪টি শব্দের বাংলা অর্থ জানেনা যার শতকরা হার ৫০ ভাগ অপরদিকে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুরা ৮ থেকে ১০টি শব্দের বাংলা অর্থ পারেনি যার শতকরা হার প্রায় ২০ ভাগ। অবস্থান অনুযায়ী এই হার শহরে ২০% (প্রায়) এবং গ্রামে ৬০ ভাগ (প্রায়)। অর্থাৎ শহরের শিশুরা দ্রুত বাংলা শিখছে। শিশুদের সার্বিকভাবে মাতৃভাষায় শব্দ অর্জনের সক্ষমতার হার নির্ণয়ের একটি গ্রাফ চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

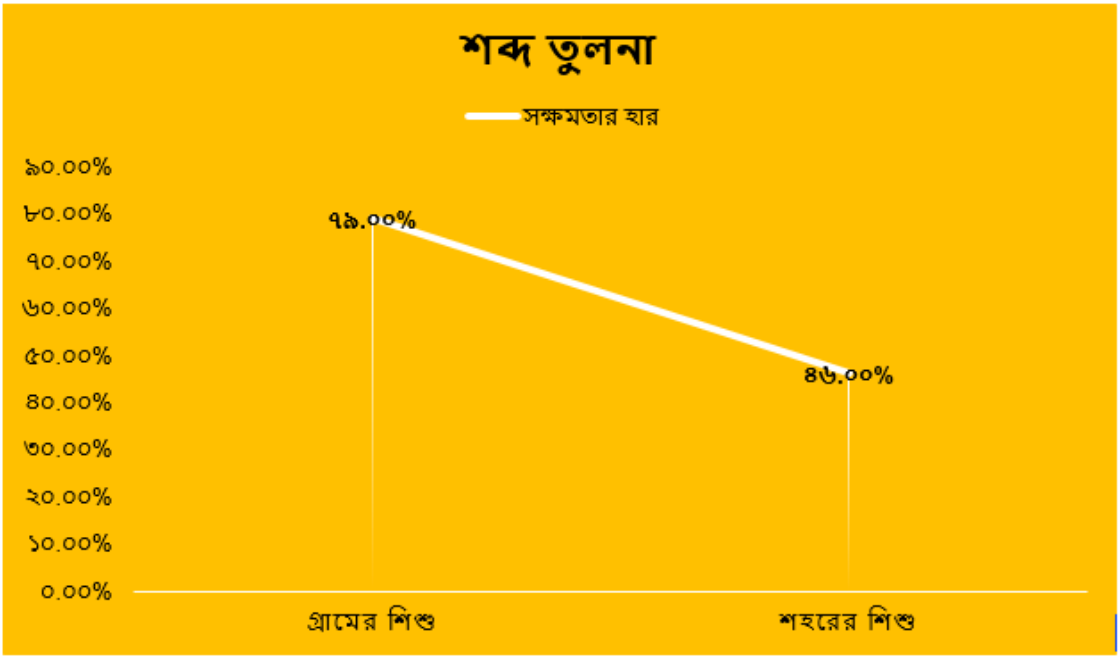

ছক: শব্দ তুলনা

উপরের গ্রাফ চিত্রে দেখা যায় যে, গবষণায় অংশ নেয়া শিশুদের মাতৃভাষার শব্দ সক্ষমতার হারের দিক থেকে গ্রামের শিশুরা এগিয়ে, তাদের শব্দ সক্ষমতার শতকরা হার প্রায় ৭৯ ভাগ। অপরদিকে শহরে বসবাসকারী সাঁওতালি শিশুদের মাতৃভাষার শব্দ সক্ষমতার শতকরা হার ৪৬ শতাংশ।

বাক্যতত্ত্ব

(Syntax)

বাক্য গঠনে সক্ষমতা (Skill in Sentence Formation)

আমরা উপাত্ত সংগ্রহের সময় সাঁওতালি ভাষী শিশুদের বাংলা বাক্যগঠন সক্ষমতা পরীক্ষন করেছি। সাধারণত দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে সাঁওতালিদের অর্জন শুরু হয় ৫ বছর বয়স থেকে। তাই ভাষা অর্জনের বাক্য গঠনে আমরা এক, দুই, তিন শব্দের পরীক্ষন করেছি। পাশাপাশি বহু শব্দের মাধ্যমে গঠিত বাক্যেরও পরীক্ষণ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সাঁওতালি শিশুরা বাংলা জটিল বাক্য বলতে সক্ষম হয় নি। নিম্নে যে ২০ জন শিশুর কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের প্রদেয় উত্তরের ভিত্তিতে সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা বাংলায় বাক্যগঠনে সক্ষমতার হার দেখানো হল-

বাক্যের ধরণ	একশব্দ	দুই শব্দ	সরল বাক্য	জটিল বাক্য
জন	২০	২০	১৭	৯
শতকরা হার	১০০%	১০০%	৮৫%	৪৫%

ছক: বাংলা বাক্যগঠনে সাঁওতালি শিশুর দক্ষতার হার।

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে যেসব সাঁওতালি শিশুর কাছ থেকে উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে তারা সকলেই একশব্দ ও দুইশব্দের বাংলা বাক্যে পারঙ্গম, তবে তিনশব্দের সরল বাক্য গঠনে তাদের মধ্যে ২৫ ভাগ শিশু অক্ষম এবং জটিল বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের বিপর্যয় দেখা যায়। অর্থাৎ প্রায় ৫৫ ভাগ শিশু জটিল বাক্য গঠন করতে পারে নি। যে সাঁওতালি বাক্যগুলো বাংলা ভাষার দক্ষতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

ধরণ	বাংলা বাক্য	সাঁওতালি বাক্য
একশব্দ	যা	cala?me
দুইশব্দ	আমি যাই	ir cala?kanae
তিনশব্দ/সরল বাক্য	সে বাড়ি যায়	uni cala?kanae
জটিল বাক্য	সীতা বাড়ি গিয়ে ভাত খায়	sita ora?ra cakaokate dakae joma

ছক: গবেষণায় ব্যবহৃত বাক্য

সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনঃ সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা অভিসন্দর্ভটি মূলত সাঁওতাল সমাজে ভাষিক অবস্থা পর্যবেক্ষনের একটি বাস্তব উপস্থাপন। আমাদের গবেষণায় মৌলিক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণটি মুখ্য না হলেও দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের ভাষা ব্যবহারের ধরণ এ বিষয়ে কৌতুহল জাগায়। এই অধ্যায়ে তাই সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রপঞ্চের সাথে মৌলিক ভাষাবিজ্ঞানের কিছু বিষয় যা সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা আলোচনা করা হয়েছে। যদিও আমরা মনে করি এ বিষয়ে আরো সূক্ষ্ম নির্ণয়ের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু উপাত্ত ও সময় স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। এখানে বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে বাক্যের বিশ্লেষণ দেখানো হয়নি এই কারণে যে বাংলা ও সাঁওতালি ভাষার বাক্যের গঠন একই।

কেস স্টাডি- ১

বৃষ্টি মার্ডি

বৃষ্টি মার্ডির বয়স ৫ বছর। গোদাগাড়ি উপজেলায় মধুমাঠ গ্রামে তার বাড়ি। তার ধর্ম সাঁওতালি সনাতন। বৃষ্টি তার বাবা মা এর একমাত্র সন্তান। তার বাবা মা উভয়ই মাঠে কাজ করে মৌসুমে। ফলে বৃষ্টিকে গ্রামের আরো সাঁওতাল সমবয়সী ছেলে মেয়ের সাথে খেলতে দেখা গেল। আমরা যাওয়াতে গ্রাম প্রধান অন্য আরো কয়েকটি শিশুর সাথে বৃষ্টিকেও ডাকলেন।

মাতৃভাষায় বৃষ্টি সাবলীল। ফলে সাথে থাকা সাঁওতালি ভাষী গবেষণা সহকারী তাকে প্রশ্ন করল মাতৃভাষাতেই। বৃষ্টি কী করে মাতৃভাষায় এত সাবলীল জানতে চাইলে মাঠ ফেরত বাবা জানালেন তাদের পাড়াতে বিদ্যুত নেই। তাই বাংলাদেশের গণমাধ্যমের প্রধান ভাষা বাংলা তারা খুব একটা শুনতে পান না। পাড়ায় তারা সবাই সাঁওতালি ভাষাতেই কথা বলেন। এছাড়া বাঙালি বসতি তাদের থেকে দূরে। তারা নিজেরাও অনেক পরে বাংলা ভাষা শিখেছেন কাজের প্রয়োজনে। তবে বাংলাতে এ গ্রামের লোকজনও তেমন একটা সাবলীল নয় বলে জানালেন তিনি।

ইদানিং অত্যাধুনিক স্মার্ট মোবাইল আসার ফলে বাংলা ও হিন্দি নাচ গান, সিনেমা তারা দেখেন। সেখান থেকে বাচ্চারা ভাষা আংশিক বুঝলেও বলতে পারেনা। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলার পাঠ তারা পায় বিদ্যালয়েই। তার আগে অবশ্য যে বাবা মা শিক্ষিত তারা বাড়িতে কিছু কিছু বাংলা ভাষার বর্ণ-জ্ঞান দিয়ে থাকেন শিশুদের। গ্রাম প্রধানের বক্তব্যে জানা গেল সাঁওতালি শিশুদের বাংলা ভাষা শিখতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া এসব শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ শেষ করতে পারে না। ভাষা প্রতিবন্ধকতার সাথে সাথে আর্থিক প্রতিবন্ধকতাও এর জন্য দায়ী।

বৃষ্টি আমাদের কে সাঁওতালি গান গেয়ে শোনায়। ৫ বছরের শিশুর জন্য এটিই স্বাভাবিকতা; শহরের সাঁওতালদের ১২ বছরের শিশুর মধ্যেও যা দেখা যায় নি।

কেস স্টাডি- ২

লুসি হাজরা

লুসি একটি সাঁওতালি ভাষী মেয়ে শিশু। তার বয়স ৭ বছর, ধর্ম খ্রিস্ট। বর্তমানে সে রাজশাহী শহরের টুলটুলি পাড়ার সাঁওতাল পাড়ায় তার নানা নানীর সঙ্গে বসবাস করে। একবছর পূর্বে লুসি বাবা মায়ের সাথে নিজ গ্রামেই থাকতো। কিন্তু সাংসারিক অভাবের কারণে লুসির মাও তার বাবার সঙ্গে কাজে যোগ দিলে লুসিকে দেখাশোনা করার মত কেউ ছিল না। ফলে বাবা মা তাকে লেখাপড়া ও অন্যান্য সুবিধাদি বিবেচনা করা নানা নানির কাছে শহরে পাঠিয়ে দেয়।

শহরে এসে লুসি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সে বাংলা ভাষার কিছুই বুঝতে পারত না। বরং শহরে বসবাসকারী লুসি তার কিশোরী খালাদের চেয়েও ভাল সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে পারত। কিন্তু ধীরে ধীরে পাড়ার অন্য সম্প্রদায় যেমন ওঁরাও, বাঙালিদের সাথে খেলাধুলা, বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা এবং পরিবারেও বাংলা ব্যবহারের ফলে সে এই এক বছরেই বাংলা ভাষায় বেশ ভাল দক্ষতা অর্জন করেছে। লুসির কাছে এখন বাংলা ভাষা বেশ সহজ মনে হয়। বিদ্যালয়েও সে এই ভাষায় শিক্ষকের কথা বুঝতে পারে। ইদানীং লুসির আর সাঁওতালি ভাষায় কথা বলা হয় না। লুসির নানা জানালেন, বাংলা ভাষায় কথা বলতে লুসি এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা বোধ করে। অনেক ক্ষেত্রেই সে বাংলা বাক্যে সাঁওতালি শব্দ ব্যবহার করে। তবে ধীরে ধীরে এর মাত্রাটা কমে যাচ্ছে। অনেক সাঁওতালি শব্দই সে এখন আর ব্যবহার করে না, যা সে আগে ব্যবহার করত। শিক্ষা গ্রহন ও সমাজ বাস্তবতার কারণে মাতৃভাষা প্রয়োগ সীমিত, ফলে লুসি যদি এখন মাতৃভাষা ভুলে বাংলাকে প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহার শুরু করে তবে পরিবারের সেক্ষেত্রে দুঃখ থাকলেও আপত্তি নেই।

তথ্যসূত্র

১. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা।* ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স।

২. চৌধুরী, ভীষ্মদেব। (২০১১)। *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা।* ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

৩. নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ।* কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ।

৪. শ' রামেশ্বর। (২০০৪)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

৫. সিকদার, সৌরভ। (২০০২)। *ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা।* ঢাকা অনন্যা

৬. হাঁসদা, গাব্রীয়েল। (২০০৯)। *সান্তাল সমাজ ও রীতিনীতি।* রাজশাহী: আদিবাসী বিকাশ কেন্দ্র।

৭. হাঁসদা, গাব্রীয়েল। (২০০৯)। *সংক্ষিপ্ত সান্তালী অভিধান।* রাজশাহী: ব্যক্তিগত প্রকাশনা।

৮. Grierson, G.A. (1906). *Linguistic Survey of India.(vol iv)* . Calcutta: Office of the suptt. Government printing press, india.

৯. Merritt, Anne. (2014). *Are women really better ar learning languages?* Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/

১০. Schiller, Niels O. (Edt). (2015). *The Gender Gap in Second Language Acquisition*. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

*সাঁওতালি ভাষা গবেষক[১] - হাঁসদা, গাব্রীয়েল।

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

পূর্বের অধ্যায়ে সাঁওতালি ভাষী শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রপঞ্চগুলো সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার পর্যালোচনা করা হবে। এর ফলে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো বোঝার ক্ষেত্রে পর্যালোচনাটি সহায়ক হবে। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর একটি ধারাবাহিক উপস্থাপনা তুলে ধরা হল।

গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল (Significant Result)

১) ভাষীর মাতৃভাষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।

২) দ্বিতীয় ভাষা অবস্থান ব্যবহারিক জীবনে প্রবল।

৩) মাতৃভাষা সম্পর্কে জনগোষ্ঠী সচেতন নয়।

৫) ধর্মীয় পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ভাষা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

৬) শহরঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে ভিন্নতা রয়েছে।

৭) ভাষী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করছে।

৮) বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহনে তারা তেমন কোন অসুবিধা বোধ করছে না যেমনটি পার্বত্য অঞ্চলে করে থাকে।

৯) বাঙালি প্রভাবমুক্ত অঞ্চলে শিশু ৬ বছরের পর বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে।

১০) বাংলা প্রভাবযুক্ত অঞ্চলে ৯ থেকে ১১ বছর বয়সের মধ্যে শিশু ঠিকমত মাতৃভাষা সাঁওতালি আয়ত্ত করে। এবং এর পূর্বেই অর্থাৎ মাতৃভাষা শেখার পূর্বেই বাংলা আয়ত্ত করে পরিপূর্ণ ভাবে।

১১) দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা শিখনে মাতৃভাষার উচ্চারণভঙ্গি (accent) প্রভাব বিস্তার করে।

১২) আত্মীয়বাচক শব্দগুলোর ব্যবহার অবিকৃত থাকে।

সামাজিক প্রভাবকসমূহ (Social Impactors)

ভাষা অর্জন মনোগত সংক্রিয়ার পাশাপাশি একইসাথে একটি সামাজিক সংক্রিয়া। ভাষীর সামাজিক অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য আরেকটি ভাষা শেখার তাগিদ দেয়। ভাষী তাই কখনো সচেতন আবার কখনো অবচেতন মনে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে বেশ কিছু প্রভাবক। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সাঁওতালি ভাষীরা অধিকাংশরাই সতস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অর্জন করে। তবে তাদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের পেছনে সক্রিয় থাকে বেশ কিছু প্রভাবক। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক) মিশ্র সমাজব্যবস্থা (Mixed Social System)

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ৯৮ শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষী এবং তারা বৃহত্তর বাঙালি সমাজে বসবাস করে। তবে বাকী ২ ভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য এদেশের সমাজ ব্যবস্থা মিশ্র। কেননা তারা নিজেদের সংস্কৃতি ধারণ করার পাশাপাশি একই সাথে প্রতিনিয়ত বাঙালি সংস্কৃতির সাথে বসবাস করে। রাজশাহীতে আমরা যে অঞ্চলে উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সেখানে সাঁওতালি ভাষী জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি ওঁরাও, পাহান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাথে একই গ্রামে বসবাস করে। দৈনন্দিন নানা কাজে তাই তাদের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের যোগাযোগের জন্য সাঁওতালরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে বাংলা ভাষা তাদের জন্য লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা বা সাধারণ যোগাযোগীয় ভাষার কাজ করে।

খ) ধর্মীয় কারণ (Religious Causes)

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশী মিশনারি কর্তৃক আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত-করণের বিষয়টি চালু হতে থাকে। সে সময় সামাজিক অগ্রগতির আশায় অনেকেই আদিধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। এ অঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক পশ্চাৎ-মূখীতা কাটাতে ব্যাপকহারে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহন করতে থাকে। ফলে সাঁওতালি জনজীবনে এর একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব দেখা যায়। এই প্রভাব তাদের ভাষাতেও বিদ্যমান। সাঁওতালসহ এদেশীয় অন্য আদিবাসী সম্প্রদায় যারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহন করেছেন তারা, মনোগতভাবে একটি ধর্মীয় ঐক্যে বিশ্বাসী। যেখানে যোগাযোগের সাধারন ভাষা বাংলা। ফলে ধর্মী আচার এবং গোত্রগত পরিচয়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষায় অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

গ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ (School Environment)

সাঁওতাল সমাজে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের জন্য প্রথম থেকেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার একটি অনুকূল স্থান থাকে। মাঠ গবেষণায় দেখা গেছে শহরের অনেক বাড়িতেই সাঁওতাল বাবা মা শিশুদের সাথে তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় কথা বলে। এছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা মাধ্যম বাংলা হওয়ায় এবং বাংলা ভাষী শিক্ষক ও শিশু সহপাঠীর কারণে সাঁওতালি ভাষী শিশু কিছুটা বাধ্যতামূলকভাবেই বাংলা ভাষা অর্জন করে।

ঘ) অনাগ্রহ (Reluctance)

মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহহীনতা সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের আরেকটি প্রধান প্রভাবক। কর্মক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষার ব্যবহার উপযোগীতা না থাকায় এই ভাষা নিয়ে অনেক সাঁওতালি ভাষীর অনাগ্রহ দেখা যায়। তারা মনে করেন বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় এ ভাষার কোন ব্যবহার নেই ফলে অনেক বাবা মা-ই সন্তানকে মাতৃভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা শেখানোয় আগ্রহী।

ঙ) অস্বস্তি (Discomfort)

পরিবারের বাইরে অনেক সাঁওতালি ভাষীই তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করেন। ফলে সামাজিকভাবে অস্বস্তি এড়াতে অনেক সময় দুইজন সাঁওতালি ভাষী অন্য ভাষা সম্প্রদায়ের সামনে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। গ্রামের ক্ষেত্রে যেখানে সাঁওতাল প্রধান এলাকা সেখানে শিশুরা কিছুটা বড় হবার পর পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা অর্জন করতে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে ভাষাগত অস্বস্তি।

মাতৃভাষায় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাঁওতালি ভাষার সম্ভাব্যতা (Pre-primary Schooling in Mother Tongue and Possibilities of Santali Language)

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এ কার্যক্রম অনুসরনে ২০১২ সালে প্রাক-প্রাথমিক পুস্তক তালিকায় প্রথম যে ৬টি ভাষার নাম আসে সাঁওতালি ভাষা তার একটি। ২০১৭ সালে চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো ও সাদরি ভাষার পুস্তক প্রণীত হলেও সাঁওতালি ভাষার পুস্তক প্রনীত হয়নি। এর প্রধান কারণ সাঁওতালি লিপি বিতর্ক। প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসী শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে যে ভাষা প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে তা আমাদের গবেষণায় ব্যতিক্রম ভাবে উঠে এসেছে। বিশেষত শহরে সাঁওতালি শিশুদের ভাষা প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি তেমন ভয়াবহ নয়। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে জানা গেছে বিদ্যালয়ে সাঁওতালি শিশুরা ভাষা প্রতিবন্ধকতার শিকার নয়। তবে গ্রামাঞ্চলে এর উলটো চিত্র দেখা যায় অর্থাৎ সেখানে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সাঁওতাল শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহনে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।

আমাদের গবেষণা এই মাতৃভাষায় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভব্যতা যাচায়ের প্রসঙ্গে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উঠে এসেছে মাঠ গবেষণা থেকে।

১) অনেক অঞ্চলে সাঁওতালি শিশুরা মাতৃভাষা সাঁওতালি শেখার পূর্বেই বাংলায় অভ্যস্ত; অর্থাৎ বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় পাঠ গ্রহনে তাদের কোন সমস্যা নেই।

২) অনেক শিশুই ঠিক মত সাঁওতালি ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে না। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের শিশুরা।

৩) মাতৃভাষায় শিক্ষায় তাদের শিক্ষক নেই। বিশেষ করে দুরবর্তী গ্রামীন জনপদে।

৪) মাতৃভাষায় বিদ্যালয়ে পাঠদানে আগ্রহী নন অনেক অভিভাবক।

৫) মাতৃভাষা শিক্ষা অনেক শিক্ষার্থীর জন্য স্বস্তিদায়ক নয়।

যেকোনো ভাষীর জন্য মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা জরুরি। কিছু অঞ্চলে সাঁওতালি শিশুদের বাংলা ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহনে অসুবিধা না থাকলেও সাঁওতালি ভাষা সংরক্ষণ করার প্রয়োজনেই নতুন প্রজন্মের কাছে এই ভাষার প্রবাহমানতা ধরে রাখার জন্য মাতৃভাষায় প্রাক প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক চালু করা জরুরি।

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি শিশুর স্বতঃস্ফুর্ততা (Spontaneity of second language acquisition of Santali children)

মাঠ গবেষণায় দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি শিশুর স্বতঃস্ফুর্ততা লক্ষণীয় ছিল। অনেক সাঁওতালি শিশুকে দেখা গেছে তারা একই সাথে তিন থেকে চারটি ভাষায় পূর্ণ কিংবা অর্ধভাষী। পর্যবেক্ষন ও মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তের মাধ্যমে আমরা সাঁওতালি ভাষী শিশুদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা অর্জনে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখতে পাই। বাংলা ভাষায় পারদর্শীতা সম্পর্কে অধিকাংশ অভিভাবক জানান বাড়িতে তারা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। অনেক সময় তারা মাতৃভাষায় কথা বলার চেষ্টা করলেও সন্তানদের অনাগ্রহের কারণে তা আর চালিয়ে যেতে পারেন না। অভিভাবকরা এই অনাগ্রহের প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন বহুভাষীক পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহারের অস্বস্তিকে। তবে শহরে বসবাসকারী অধিকাংশ শিশুই আমাদের জানিয়েছে বাড়িতে তাদের ভাষীক পরিবেশ অনুসারে বাংলাই মাতৃভাষার স্থান দখল করে নিয়েছে এবং একটু বড় হয়ে যখন তারা মাতৃভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাঁওতালি ভাষা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। ফলে শহরের শিশুদের কেউ কেউ ১১/১৩ বছর বয়সেও সঠিকভাবে মাতৃভাষা অর্জন করতে সক্ষম হয়না।

আমাদের গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে দেখা যায় যেসব অঞ্চলের সাঁওতালি শিশুরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত তাদের ভাষীক প্রতিবেশ, যেসব সাঁওতালি শিশুরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত নয় তাদের থেকে ভিন্ন। বিশেষত, গণমাধ্যম, বিদ্যালয় সুবিধা, অন্য ভাষী ও বাংলা ভাষীদের সঙ্গে মেলামেশার প্রেক্ষাপট থেকে। ফলে ভাষীক প্রতিবেশই সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ততা অর্জনকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রন করে বলে ধারণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ও মাতৃভাষা হিসেবে সাঁওতালি ভাষার গুরুত্ব (Importance of Bengali as Second language & Santali as Mother-tongue)

বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষীদের জন্য বাংলা ভাষা একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ভাষা। বিশেষত এই ভাষার ব্যবহার ছাড়া বাংলাদেশে সাঁওতালসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী বহুভাষী পরিস্থিতিতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারেনা। সেদিন বিবেচনায় মাতৃভাষার পর পরই এবং কোথাও কোথাও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বসবাসরত অন্য আদিবাসীদের মতই সাঁওতালিরা মাতৃভাষার চেয়েও অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে বাংলা ভাষা কে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও প্রধান শিক্ষা মাধ্যম। তাই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই বাংলাদেশীদের এই ভাষা জানা প্রয়োজন। তবে আদিবাসীরা যখন এই ভাষাটি নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ

করবে, তখন তাদের নিজস্ব ভাষার (যেমন সাঁওতালি) সঙ্গে কখনোই বাংলা ভাষা মিলিয়ে একটি মিশ্র ধারার ভাষা প্রয়োগ কখনো কাম্য নয়। তবে ভাষার প্রবাহমানতার দিকে খেয়াল করে বলা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশাপাশি দুটি বা ততোধিক শক্তিশালীর ভাষার প্রয়োগে মিশ্রন অবশ্যম্ভাবী। এভাবে তৃতীয় কোনো ভাষার সৃষ্টি হতে পারে। যেমনটি হয়েছে সমতলের সাদরি ভাষার ক্ষেত্রে। একাধিক ভাষার ব্যবহার থাকায় সে অঞ্চলে পিজিন ভাষা হিসেবে সাদরির জন্ম। ফলে একথা বলা যায় যে, যেহেতু সাঁওতালি ও বাংলা উভয় ভাষাই এই প্রবাহমানতার বাইরে নয় তাই যুগের পরিবর্তনের সাথে এর ব্যবহারকারীদের মাধ্যমেই এতে পরিবর্তন আসতে পারে। তবে দুটি ভাষার ব্যবহারকারীরা ভাষা ব্যবহারে নিজেদের মধ্যে আরেকটু সচেতনতা সৃষ্টি করলে তা ইতিবাচক হবে বলে আমরা মনে করি।

অন্যদিকে সাঁওতালিদের প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা হল সাঁওতালি ভাষা। মাতৃভাষা মায়ের ভাষা। জাতির পরিচায়ক ও স্বত্তার ভাষা। কোন কারণে এই ভাষার বিলুপ্তি হলে এই ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই মৃত্যু হয় ধীরে ধীরে। আমরা আগেই জেনেছি ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশে সমতলের অন্য অনেক ভাষার মতোই সাঁওতালি ভাষা তার ঐতিহ্য হারিয়ে হারিয়ে ফেলছে দিনে দিনে। বিশেষত বাঙালি ও বিদেশি সংস্কৃতির আগ্রাসন, ধর্মীয় প্রভাব, আকাশ সংস্কৃতি, জীবিকা ও অন্যান্য বিষয়াদি এই ভাষাটিকে ঝুকিপূর্ণ করে তুলেছে সময়ের সাথে। তবে ভাষা হিসেবে, জাতিগত পরিচয়-বাহক সাঁওতালি ভাষার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সাঁওতালি ভাষা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচীনতম ভাষা হিসেবে পরিচিত। তাই ভাষাটির শুদ্ধতা রক্ষার্থে এ ভাষার ভাষীদের যেমন এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও সাঁওতালি সমাজের উদ্যোগও থাকা প্রয়োজন। পিতা মাতার উচিত সন্তানকে মাতৃভাষা শেখায় উদ্বুদ্ধ করা। মাতৃভাষা অর্জন এদেশে আদিবাসী হিসেবে তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও এর প্রায়োগিক দিকগুলো বিবেচনা করে সাঁওতালি শিশুদের স্বাভাবিক অর্জনকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. Godesborg, B. (2007). *Language death in west Africa*. UK: Answer phone.

২. Balogun, temitope abiodun. (2013). *An Endangered Nigerian Indigenous Language: The case of Yoruba Language.* African nebula: issue 6.

৩. Crystal, David. (2000). *Language death.* Cambridge: Cambridge University Press.

৪. সিকদার, সৌরভ। (২০০২)। *ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা।* ঢাকা: অনন্যা।

নবম অধ্যায়

সুপারিশসমূহ, সম্ভাব্য গবেষণা ক্ষেত্র এবং উপসংহার

সুপারিশসমূহ (Recommendations)

আমাদের প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সাঁওতালি শিশুর মাতৃভাষা উন্নয়ন ও দ্বিতীয় ভাষা শিখনের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা যায়, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে সাঁওতালি ভাষী শিশুরা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে যারা (সাঁওতালরা) বসবাস করে তাদের ভাষা শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

ক) মাতৃভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি

বর্তমান গবেষণার বিয়য়বস্তু যদিও সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে ভাষা অর্জনের দুটি ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। শহরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবের কারণে মাতৃভাষা অর্জন ব্যহত হচ্ছে। ফলে সাঁওতালি ভাষা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ (যেমন- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান) এর কাছে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করার জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

খ) দ্বিতীয় ভাষা শিখনে উপযুক্ত পরিবেশ

সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা শিখন বা অর্জন মূলত তার প্রতিবেশ থেকে হচ্ছে, ফলে তাতে কিছু আঞ্চলিক প্রভাব থেকে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ভাষা প্রয়োগেও সাঁওতালি শিশু পুরোপুরি মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিকতার প্রভাব মুক্ত হতে পারে না। ফলে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা শিখনে উপযুক্ত পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষকের শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার দক্ষতা থাকতে হবে, বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ভিত্তিক আবৃত্তি, বিতর্ক, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করে তাতে সাঁওতালি ভাষী আদিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চত করতে হবে। বাংলা ভাষার বাস্তব প্রয়োগে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে প্রভৃতি। যাতে ভবিষ্যতে জীবনের প্রয়োজনে সাবলীল ভাবে তারা বাংলা ব্যবহার করতে পারে।

গ) শিখন উপকরণে মাতৃভাষার ব্যবহার

বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ভাষা শিখনে যেসব শিখন উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেখানে মাতৃভাষার ব্যবহার থাকা জরুরি। কেননা অনেক শিশু তার প্রতিবেশ থেকে মাতৃভাষা অর্জন করলেও তার পূর্ণাঙ্গ শিখনে বিদ্যালয় পর্যায়ে মাতৃভাষার সাহায্য নেয়া উচিত। এতে করে সে দ্রুত শ্রেণিকক্ষের জ্ঞান আয়ত্ত করতে শিখবে।

ঘ) সঠিক উচ্চারণ

বাংলা ভাষা অর্জন করলে অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার পর বাক্য গঠন ও উচ্চারণে সাঁওতালি ভাষার প্রাধাণ্য দেখা যায়। যা সংশোধন করা দরকার। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে যেহেতু বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই শিক্ষককে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারে সচেতন হতে হবে।

ঙ) বাংলা-সাঁওতালি অভিধান প্রণয়ন শিশুদের জন্য

ভাষার বোধগম্যতা সহজ করার জন্য শিশু উপযোগী সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক বাংলা- সাঁওতালি শব্দপঞ্জি প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। এতে চিত্র সংযোজন করা যেতে পারে। এধরনের অভিধান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকও ব্যবহার করতে পারেন।

চ) পাহাড়ে বসবাসরত সাঁওতালদের ভাষাগত অবস্থা জানা

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা জনিত প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাই। বিশেষত মাতৃভাষার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রটিতে। তবে সমতলে বাসস্থান ও অন্যান্য প্রতিবেশের কারণে দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না। সাঁওতালদের কেউ কেউ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর সিলেটে বসবাস করে সেখানে তাদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের অবস্থা জানা প্রয়োজন।

ছ) মাল্টি মিডিয়ার ব্যবহার করা

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার উপযোগিতা অনুধাবন করে শ্রেণিকক্ষে মাল্টি-মিডিয়া ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া ফ্লাস কার্ড, চার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে দুটি ভাষাতেই শিশুর দক্ষতা তৈরি করা সম্ভব।

জ) মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন

২০১৭ সালে বাংলাদেশে পাঁচটি আদিবাসী বা ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে সরকারিভাবে। লিপি ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব থাকার কারণে প্রথম পর্যায়ে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকার পরও সাঁওতালি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা যায়নি। তবে বাস্তবতা বিবেচনায় সাঁওতালি ভাষার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও মাতৃভাষা ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হওয়া জরুরী।

ঝ) লিপি গ্রহনের সিদ্ধান্ত

সাঁওতালদের একাংশ রোমান লিপি অন্য অংশ বাংলা লিপির সমর্থন করেন। এক্ষেত্রে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নিয়ে সাঁওতালি ভাষার জন্য যেকোনো একটি লিপি গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

ঞ) শিশুর অর্জিত দক্ষতা যাচাই করা

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি ভাষী একটি শিশু কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যাচাই করে তার শিখনে যত্ন নিতে পারেন।

ট) সম্প্রদায় সমতা

একটি সাঁওতালি শিশু প্রকৃতিগতভাবেই অনেক সময় দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করতে পারে, আবার নাও পারে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় কিংবা অন্য কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা ব্যক্তিকে সাঁওতালি শিশুর ভাষিক দক্ষতা অর্জনে অন্য সম্প্রদায়ের শিশুর মতই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

ঠ) অবাঙালি শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

সাঁওতালি ভাষি শিশুর বিদ্যালয়ে যদি কোনো অবাঙালী শিক্ষক থাকে তবে তাকে মাতৃভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ড) সামাজিক সহযোগিতা

ভাষা অর্জনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে সাঁওতালি শিশুর সামাজিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ঢ) পারিবারিক চর্চা

মাতৃভাষা চর্চা ধরে রাখাটা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি। তাই পারিবারিক ভাবে সাঁওতালি ভাষার সামগ্রিক বিপন্নতা ঠেকাতে পরিবারের অভিভাবকদের উচিত শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষার ব্যবহার অব্যহত রাখা। পাশাপাশি দ্বিতীয়ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষারও সঠিক ব্যবহারে তাদের খেয়াল রাখতে হবে।

জ) ভাষানীতি প্রনয়ন

বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষাগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভাষিক বিপন্নতা রোধে জাতীয় পর্যায়ে সার্বজনীন ভাষানীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সম্ভাব্য গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ (Further Research Suggestion)

ক) বাংলা-সাঁওতালি শব্দের মিশ্রণ, এর প্রভাব, আবিকৃত সাঁওতালি রূপ নিয়ে শব্দভান্ডারগত সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।

খ) *গ্রামীণ ও শহরের সাঁওতাল ভাষীদের ভাষায় বাংলা* ভাষার প্রভাব এই শিরোনামে একটি তুলনামূলক আলোচনাভিত্তিক গবেষণা হতে পারে।

গ) সাঁওতালি ভাষার উপভাষিক বৈচিত্র নির্ণয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতালি ভাষীদের ভাষার উপভাষিক বৈচিত্র্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করা যেতে পারে।

ঘ) ভারত ও বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষিদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষার ব্যবহারের ধরন ও হার নিয়ে একটি তুলনামূলক সমাজভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা হতে পারে।

ঙ) সাঁওতালি ভাষী শিশুদের ভাষাগত সমস্যা নিরূপনের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালিত হতে পারে।

চ) মাতৃভাষায় শিক্ষার উপযোগিতা ও খাপ খাওয়ানোর প্রবণতা সম্পর্কিত একটি মূল্যায়ণভিত্তিক গবেষণা হতে পারে।

ছ) বর্তমান গবেষণার মত একই ধরণের গবেষণা আরো বৃহৎ জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করে, বৃহৎ পরিসরে পরিচালিত হতে পারে।

জ) বর্তমান গবেষণায় বর্ণিত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় কি সে সম্পর্কিত নির্দেশনামূলক গবেষণা হতে পারে।

এ) বাংলাদেশের আদিবাসীদের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য একটি গবেষণা হতে পারে।

ত) বাংলা ভাষা শিক্ষায় আদিবাসীদের কি কি সমস্যা হতে পারে ? তা নিরূপণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

গ) বাংলাদেশে মুন্ডা উপগোত্রের ভাষা (সাঁওতালি, মুন্ডা, মাহলে, কোল ইত্যাদি) একটি তুলনামূলক সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার কিংবা সুশীল সমাজ কর্তৃক বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে আদিবাসীদের শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ভাষার দিকটিও এসেছে। ফলে সরকার এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। যার একটি আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন।

আমাদের বর্তমান গবেষণার শিরোনাম '*সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা*'। ফলে সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চ সক্রিয় আমরা তা বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসমূহ যেমন এখানে আলোচিত হয়েছে, তেমনি জনগোষ্ঠী হিসেবে সাঁওতাল ও ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা সাঁওতালির উৎস অনুসন্ধানেও আমরা ব্যপীত হয়েছি। বিশেষত সাঁওতাল জাতি ও তাদের ভাষা যে ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রাচীন নৃগোষ্ঠী আদি-অস্ট্রাল জাতি ও অস্ট্রিক ভাষার বিবর্তিত রূপ তা নির্ণয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব-উপাত্তের সন্নিবেশ করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। আমরা মনে করি একটি জাতির দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সে জাতির উৎস, ভাষা ও সংস্কৃতিরও বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এই প্রাসঙ্গিকতা থেকেই মূলত বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও এখানে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতির নিয়মতান্ত্রিক প্রয়োগে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখেছি সাঁওতালি সমাজে শিশুদের মধ্যে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা উভয়ই রয়েছে। যদিও আমরা শহর কেন্দ্রিক সাঁওতালি শিশুদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষায় অদক্ষতা দেখতে পেয়েছি। মাতৃভাষায় পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাঁওতালি সমাজে বুলিসরণ, সামাজিক শ্রেণি, মনোভাব, ধর্ম, বয়স ও লিঙ্গ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চসমূহ কীভাবে সক্রিয় তা পরীক্ষণের মাধ্যমে এই অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত হয়েছে। সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা ব্যবহারে স্বকীয়তা চিহ্নিত করতে আমরা তাদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোগত ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছি। সেখানে ভাষা ব্যবহারে সাঁওতালি শিশুদের ধ্বনি, রূপ ও বাক্যতত্ত্বীয় আলোচনায় প্রমিত বাংলা ভাষার সাথে তাদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার পার্থক্যগুলো দৃশ্যমান হয়েছে। গবেষণার ফলাফল হিসেবে আমরা সাঁওতালি শিশুদের মধ্যে ভাষিক প্রতিবন্ধকতা, মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বাস্তবতা, দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে শিশুর পারিপার্শ্বিকতা, ভাষা সচেতনতার অভাব, সাঁওতালি শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে দ্বিতীয় ভাষার প্রায়োগিক গুরুত্ব, শিশুর অবস্থানভিত্তিক ভাষা অর্জনের সক্ষমতা ও বয়সের ভূমিকা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। যা দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতালি

ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা অর্জনেও এই মৌলিক বিষয়গুলোতে বৈচিত্র্য দেখা গেছে। যা এই গবেষণার সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি গবেষণার শুরুতেই একটি অনুমান বা Assumsion গ্রহণ করা হয়। আমাদের গবেষণাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ-তথ্যাদির সাথে আমাদের অনুমানটি খুব একটা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আমাদের পূর্বানুমান ছিল যে সাঁওতালি শিশুরা দ্বিতীয় ভাষা শিখতে বাধাগ্রস্থ হয়, যেমনটি পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী শিশুরা বাধাগ্রস্থ হয়। কিন্তু সমতলের আদিবাসী সংখ্যা বৃহৎ হলেও সাঁওতালি ভাষা একটি সাঁওতাল প্রজন্মের জন্য বিপন্ন প্রায়। কেননা, শহরে বসবাসরত আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বেশিরভাগই অর্ধ-ভাষী বা Semi-Speaker এবং তাদের মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার সম্পর্কে তেমন কোনো সচেতনতা নেই। যা একটি ভাষার অস্বিত্বকে শংকার মধ্যে ফেলে দেয়। এই গবেষণায় দ্বিতীয়ভাষা অর্জনে তাদের সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নতকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর আংশিক ভাষাগত বিপন্নতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায়, একদিকে যেমন সাঁওতালদের ভাষায় তাদের ধর্মান্তরের প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি অশিক্ষা, অভাব এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে। এছাড়া গবেষণা ফলাফলে আরো দেখা যায় সাঁওতালিদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং শহর ও গ্রামের সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারেও পার্থক্য বিদ্যমান। তারা নিজেদের ভাষা বিষয়ে যেমন সচেতন নয় তেমনি দ্বিতীয় ভাষা বাংলা শেখার ক্ষেত্রেও তাদের মাতৃভাষার প্রভাব স্পষ্ট। অল্প বয়সে তারা যেমন বাংলা ভাষা অর্জনে সক্ষম হয়, তেমনি মাতৃভাষার সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়। এমনকি শুদ্ধভাবে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনেও তাদের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

সাঁওতালি ভাষা বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষাগুলোর মধ্যে ভাষীর দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। পাশাপাশি এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ভাষাও। ফলে স্বজাতিত্ব ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ভাষার যেমন ঐতিহ্য রয়েছে তেমনি বাংলাদেশের বাস্তবতায় দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক গুরুত্বও রয়েছে। বাংলা ভাষা সাঁওতালি ভাষীদের শিক্ষা ও যোগাযোগর প্রধান মাধ্যম। ফলে বাংলাদেশের সমতলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের সামাজিক অগ্রগতির পরিমাপক হিসেবে আমরা সাঁওতালি ভাষী শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের সক্ষমতাকে একটি সূচক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তাই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সাঁওতালি ভাষী শিশুকে মাতৃভাষা ব্যবহারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা অর্জন এবং এর সঠিক ও সাবলীল ব্যবহার করার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশে সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কথা ভেবেই।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলী, জিনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা।* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২. আলী, এম. হাসান। (২০১৩)। *সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান।* ঢাকা: অনু প্রকাশনী।

৩. *আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং-১০৭) ও আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং-১৬৯)।* (২০১২)। ঢাকা: অন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

৪. ইসলাম) মোঃ শরিফুল ,২০১৫(। *বাংলা লিপি।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org

৫. উদ্দিন, হেলাল আহমেদ । (২০১৫)। *ইতিহাস।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org

৬. কামাল, মেসবাহ সম্পাদিত। (২০১৫)। *বাংলাদেশের আদিবাসী জীবনসংগ্রাম ও মানবাধিকার।* ঢাকা: উৎস প্রকাশন ও আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন।

৭. কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.)। (২০১০)। *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

৮. কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.)। (২০০৭)। *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৯. খান, আলী আকবর ও দে, তপন কুমার। (২০০৮) *বাংলাদেশের কয়েকটি জনগোষ্ঠী।* ঢাকা: কথন প্রকাশন।

১০. ঘোষ, সুবোধ। (২০০০)। *ভারতের আদিবাসী।* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

১১. চৌধুরী, আবদুল মমিন। (২০১৪)। *বঙ্গ।* Retrieved from http://bn.banglapedia.org

১২. তাহের, মো আবু, (২০০৮)। *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি।* ঢাকা: অনু প্রকাশনী।

১৩. নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ।* কলকাতা: নয়া উদ্যোগ।

১৪. *প্রাচীন বাংলার জনপদ।* (২০১৪)। Retrieved from https://www.teachers.gov.bd/content/

১৫. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। (২০১২, ১৯৪৫)। *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ।* কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১৬. মুরমু, মিথুশিলাক। (২০০৯)। *আদিবাসী অন্বেষণ।* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান।

১৭. মুসা, মনসুর। (২০০০)। *প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা।* ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা:) লিমিটেড।

১৮. মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। (১৯৮৫)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব।* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১৯. রহমান, এম এস এ আতীকুর। (২০০৫)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি।* ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

২০. রহিম, মুহাম্মদ আবদুর ও অন্যান্য। (১৯৭৭)। *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

২১. রায়, সুপ্রকাশ। (২০০৮)। *সাঁওতাল বিদ্রোহ।* কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

২২. শ' রামেশ্বর। (২০০৪)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

২৩. সরকার, পবিত্র এবং হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০১৫) *বাংলা ভাষা।* Retrieved frombn.banglapedia.org

২৪. সাত্তার ।(১৯৬৬) আবদুস। ,*আরণ্য জনপদে।* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান।

২৫. সিকদার ।(২০০২) সৌরভ। ,*ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা।* ঢাকাঅনন্যা :।

২৬. সিকদার ,সৌরভ।) ২০১১(। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা।*ঢাকা :বাংলা একাডেমী।

২৭. সিকদার ,সৌরভ।) ২০০৫(। *সাঁওতালি ও ওঁরাও ভাষার শব্দাবলি ও ভাষা শিক্ষা।* ঢাকা: অক্সফাম জিবি।

২৮. সিকদার, সৌরভ (সম্পা)। (২০০৫)। *হুল।* জাতীয় উদযাপন কমিটি।

২৯. সিকদার, সৌরভ ও পলি, নাসিমা। (২০১৬)। *বাংলাদেশের ভাষা ও লিপি*। ঢাকা: অনন্যা।

৩০. সুর, অতুল। (১৯৯২)। *বাঙালি জীবনে নৃতাত্তিকরূপ।* কলকাতা: বেস্ট বুকস।

৩১. হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০৭)। *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন প্রাথমিক ধারণা।* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩২. হক, মহাম্মদ দানীউল । (১৯৯৩)। *ভাষার কথা: ভাষাবিজ্ঞান।* ঢাকা: করিম বুক কর্পোরেশন।

৩৩. হাসান, রাগিব। (২০১৫)। *গবেষণায় হাতেখড়ি।* ঢাকা: আদর্শ।

৩৪. হেম্বর্ম ,হিলারিয়াস) সম্পা(.। ২০০৮। *তেরাঙ* । জয়পুরহাট :মহান সান্তাল হুল ১৫৩ তম বর্ষপূর্তি দিবস উদযাপন কমিটি ২০০৮।

৩৫. হাঁসদা ,গাব্রীয়েল।) ২০০৯(। *সান্তাল সমাজ ও রীতিনীতি।* রাজশাহী: আদিবাসী বিকাশ কেন্দ্র।

৩৬. হাঁসদা ,গাব্রীয়েল।) ২০০৯(। *সংক্ষিপ্ত সান্তালী অভিধান।* রাজশাহী: ব্যক্তিগত প্রকাশনা।

৩৭. হুমায়ুন, রাজীব (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

References

1. Ali, Ahsan, (2008). *Sandals of Bangladesh.* Dhaka: Ashrai Research and documentation division.
2. Aminuzzaman, Salauddin. (1991). *Introduction to Social Research*. Dhaka: Bangladesh Publishers.
3. Balogun, temitope abiodun. (2013). *An Endangered Nigerian indigenous language: the case of Yoruba language.* African nebula: issue 6.
4. Bhattacherjee, Anol. (2012). *Social Science Research: Principles, Methods and Practices.* Textbook Collection, Book.
5. Bolderston, Amanda (June 2008). "*Writing an Effective Literature Review"*. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*. **39** (2): 86–92.doi:10.1016/j.jmir.2008.04.009.
6. Crystal, David. (2000). *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Catherine, j. doughty and Michael h. edt. (2003). *The Handbook of Second Language Acquisition*. Oxford: Blackwell publishing ltd.
8. Cook, Vivian. 2002. *Portraits of the L2 User.* New York: Multilingual Matters Ltd.
9. Cavallaro, Francesco & Rahman, Tania. (2009). *The Santhals of Bangladesh*. Singapore: Nanyang Technological University.
10. *Different Stages of Language Acquisition*. Retrieved from http://www.languagestudy.com
11. *Five Stages of Second Language Acquisition*. Retrieved from http://education.cu-portland.edu
12. Gass, Susan M. and Selinker, Larry. (2008). *Second Language Acquisition.* UK: Routledge.
13. Giglioli, Pier Paolo. (1972, 1987). *Language and Social Context.*, penguin books ltd.
14. Grierson, G.A. (1906). *Linguistic Survey of India*.(vol iv) . Calcutta: Office of the suptt. Government printing press, india.
15. Grierson, G.A. (1904). *Linguistic Survey of India*. Calcutta: Office of the suptt. Government printing press, india.
16. Godesborg, B. (2007). *Language death in west Africa*. UK: Answer phone.
17. *Grammatical Development* (2017) retrieved from www.revisionworld.com
18. Jonker, Jan and Pennink, Bartjan. (2010). *The Essence of Research Methodology*. London: Springer.
19. Kamal and others . 2003. *The Santal Community in Bangladesh Problems and Prospects*. Dhaka: Research and Development collective.
20. Kamal, Mesbah and Others. (2014). *Mapping of multilingual education programs in Bangladesh.* Dhaka: The UNESCO.

21. Kim, Seung and Others. (2010). *The Santali Cluster in Bangladesh: A Sociolinguistic Survey*. Dhaka : SIL International.
22. Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology Method and Techniques*. New Delhi: New Age International Publishers.
23. Kramsch, Claire. (1998, 2008). *Language and Culture.* Oxford: Oxford University Press.
24. Krashen, Stephen. (1982). *Principle ans Practice in Second Language Acquisition.* California: Pergamon Press Inc.
25. Krashen, Stephen. (2013). *Second Language Acquisition Theory, Application and Some Conjecture.* Maxico: Cambridge University Press.
26. *Literature review*. Retrieved from http://www.writing.utoronto.ca
27. Merritt, Anne (2014). *Are Women Really Better at Learning Language?* Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion
28. Muriel Saville-troike. (2006). *Introducing Second Language Acquisition.* Cambridge: Cambridge University press.
29. *Santhali*. (2017). Retrieved from https://www.ethnologue.com/
30. Schiller, Niels O. (Edt). (2015). *The Gender Gap in Second Language Acquisition.* Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
31. *Second language*. (2014). Retrieved from http://www.oxfordreference.com/
32. *Second Language.* Retrieved from http://www.ldoceonline.com/dictionary/second-language
33. *Second Language*. (n.d.) *Random House Kernerman Webster's College Dictionary*. (2010). Retrieved from July 9 2017 from http://www.thefreedictionary.com
34. Singh, Yogesh Kumar. (2006). *Fundamental of Research Methodology and Statistics.* New Delhi: New Age International (p) Ltd, Publishers.
35. Skrefsrud, L. O, (1873*). A Grammar of Santhal Language.* Benares: The Calcutta School Book and Vernacular Literature Society.
36. Spolsky, Bernard. (1998, 2004). *Sociolinguistics.* Oxford: Oxford University Press.
37. Trask, R.L.(2004). *Key Concepts in Language and Linguistics.* New york: Routhledge.
38. Trudgill, Peter. (1974,1983).Sociolinguistics: an Introduction to Language and Society. Penguin Group.
39. *Qualitative Research* Retrieved From qualitative research consultants association; retrieved from www. Qrca.org
40. Raj, V. Manuel, A santal theology of liberation. 1090. New delhi: uppal publishing house.
41. Richards, jack and others. (1985). *Longman Dictionary of Applied Linguistics.* UK: Longman group limited.
42. Violatti, Cristian**.** (2014). Ancient History Encyclopedia. Retrieved from http://www.ancient.eu
43. Walliman, Nicholas. (2011). Research methods the basic. New York: Routledge.

44. what-is-the-difference-between-qualitative-research-and-quantitative-research/ Retrieved from http://www.snapsurveys.com/blog/
45. White, Lidia. (2003). *Second Language Acquisition and Universal Grammar*. Uk: Cambridge university press.
46. Yule, George. 2010. *The study of language*. Uk: Cambridge university press.

পরিশিষ্ট ১

গবেষণা প্রশ্নমালা

সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন: সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ,

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাগ ১

প্রশ্ন: পিতা মাতার জন্য

তথ্যদাতার নাম		বয়স	
জাতি		ধর্ম	
লিঙ্গ		তথ্য গ্রহনের তারিখ	
গ্রাম		থানা	
উপজেলা		পেশা	

১। আপনার সন্তান কতজন? তাদের বয়স কত?

উ:

২। সে/ তারা কি মাতৃভাষায় পারদর্শী?

উ:

৩। বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বে কি সে অন্য ভাষা শিখেছে? শিখে থাকলে কোন ভাষা?

উ:

৪। কিভাবে শিখেছে?

উ:

৫। সে কেন অন্য ভাষা শেখে- এবিষয়ে আপনার মতামত কী?

উ:

৬। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য আরেকটি ভাষা শেখায় আপনি কি সন্তুষ্ট?

উ:

৭। আপনার সন্তান কথা বললে কি দুটি ভাষার শব্দ বা বাক্যে মিশ্রণ হয়? (সেক্ষেত্রে কোন ভাষার শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়?)

উ:

৮। প্রাথমিক অবস্থায় আপনার শিশুরা কোন ধরনের শব্দ বেশি বলে?(মাতৃভাষা / অন্যভাষার কিছু শব্দ নমুনা দিন)

উ:

৯। কত বছর বয়সে সে অন্য ভাষায় (বাংলা বা অন্য) পুরোপুরি যোগাযোগ করতে পারে (আনুমানিক)?

উ:

১০।আপনি কি চান আপনার শিশু দ্বিতীয় আরেকটি ভাষা শিখুক?

উ:

১১। চাইলে কেন চান?

উ:

১২। আপনার সন্তান দ্বিতীয় ভাষা কিভাবে শেখে? শিখনের প্রধান উৎস কী কী?

ভাগ ২

প্রশ্ন: শিশুর জন্য (বয়স অনুসারে প্রযোজ্য)

তথ্যদাতার নাম		বয়স	
জাতি		ধর্ম	
লিঙ্গ		তথ্য গ্রহনের তারিখ	
গ্রাম		থানা	
উপজেলা		পেশা	

১। তুমি কি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানো? জানলে তা কোন ভাষা?

উ:

২। কোন ভাষাটি তোমার কাছে সহজ? জানলে কোন ভাষা?

উ:

৩। তুমি এই ভাষা (দ্বিতীয়টি) কীভাবে শিখলে?

উ:

৪। বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা কোন ভাষায় পড়ালে তোমার বুঝতে সুবিধা হয়?

উ:

৫। তুমি কি শিক্ষকের সব কথা বুঝতে পার?

উ:

৬। না পারলে কেন?

উ:

৭। ধ্বনির মাধ্যমে চিহ্নায়ন

ক্রম	ধ্বনি	সাঁওতালি শব্দ	বাংলা শব্দ	অর্জিত দক্ষতা
১	m			
২	n			
৩	b			
৪	d			
৫	w			
৬	f			
৭	s			

৮। শব্দ সংগ্রহের মাধ্যমে অক্ষর বিন্যাস

অক্ষর সংগঠন	শব্দের উদাহরণ	অর্জিত দক্ষতা
cv		
cvc		
cvcvcv		
vccv		

৯। বাক্য ব্যবহার

ধরণ	সাঁওতালি	বাংলা অর্থ
একশব্দ		যা
দুইশব্দ		আমি যাই
তিন শব্দ		সে বাড়ি যায়
মিশ্র		সীতা বাড়ি গিয়ে ভাত খায়

ভাগ ৩

প্রশ্ন: শিক্ষকের জন্য

তথ্যদাতার নাম		বয়স	
জাতি		ধর্ম	
লিঙ্গ		তথ্য গ্রহনের তারিখ	
গ্রাম		থানা	
উপজেলা		পেশা	

১। আপনার বিদ্যালয়ে কি একাধিক সম্প্রদায়ের ভাষী শিশু রয়েছে?

উ:

২। আপনার বিদ্যালয়ে সাঁওতালি শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা (বাংলা বা অন্য) শিক্ষাদানে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?

উ:

৩। পদ্ধতি না থাকলে আপনি কীভাবে শিশুকে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে সাহায্য করেন?

উ:

৪। কী কারণে শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা শেখা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উ:

৫। কী কী উপায়ে তাদের দ্বিতীয় ভাষা শিখনে উন্নতি করা যায়?

উ:

৬। প্রাথমিক অবস্থায় কী ধরনের ভাষা ব্যবহার (অর্থাৎ কীভাবে তারা অন্য ভাষীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে) তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়?

উ:

৭। বিদ্যালয়ে অন্য ভাষী (বিশেষ করে বাংলা ভাষী) শিশুর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া কেমন? সহযোগিতামূলক?

উ:

৮। সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা উচ্চারণে কি মাতৃভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?

উ:

৯। আপনার জানা মতে কী ধরণের প্রভাব দেখা যায়?

উ:

১০। সাঁওতালি শিশুদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা শেখার আগ্রহ কেমন? তারা কি অস্বস্তিবোধ বা অনিহা প্রকাশ করে?

উ:

১১। দ্বিতীয় ভাষায় কাল নির্দেশে তারা কি সাবলীল?

উ:

১২। সামাজিক কোনো প্রভাবক বা কারণ কী সাঁওতালি শিশুর দ্বিতীয় ভাষা অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে?

উ:

সাঁওতালি ভাষার শব্দ-তালিকা

ক্রম	সাঁওতালি শব্দ (IPA)	বাংলা অর্থ	সক্ষমতা
১	muc	পিঁপড়া	
২	lac	পেট	
৩	hende	কালো	
৪	nana	ফুপু	
৫	maraŋgo	মাসী	
৬	kayra	কলা	
৭	mopay	সুন্দর	
৮	gaihɔpɔn	বাছুর	
৯	giɖra	শিশু	
১০	rama	নখ	
১১	kicriɟ	কাপড়	
১২	ñakic	চিরুনী	
১৩	kuɽi	মেয়ে	
১৪	daŋɽa	গরু	
১৫	k̃ahu	কাক	
১৬	p̃uʃi	বিড়াল	
১৭	sadɔm	ঘোড়া	
১৮	ʃeʈa	কুকুর	
১৯	bili	ডিম	
২০	maɽaŋ ɖaɖa	বড় ভাই	
২১	gede	হাঁস	
২২	mucaʈʔ	শেষ	
২৩	seŋgel	আগুন	
২৪	ɖɔho	রাখা	
২৫	luʈur	কান	
২৬	meʈʔ	চোখ	
২৭	ɘpum	পিতা	
২৮	ruua	জ্বর	

সাঁওতালি ভাষার শব্দ-তালিকা

২৯	k̃atup	আঙ্গুল	
৩০	ɟo	ফল	
৩১	p^{h}ata	পা	
৩২	bakadulu	ফরিং	
৩৩	haɽam ba	দাদা	
৩৪	gɔɽɔm buɽi	দাদী	
৩৫	gɔɽɔm gid̪ra	নাতি	
৩৬	c^{h}ɔɽan	চাবি	
৩৭	cercetec	টকটিকি	
৩৮	luti	ঠোঁট	
৩৯	b^{h}idi	ভেড়া	
৪০	gunt^{h}i	হাটু	
৪১	hɔtʔ	গলা	
৪২	can̪du	চাঁদ	
৪৩	haʃa	মাটি	
৪৪	hɔɽ	মানুষ	
৪৫	ɟil	মাংস	
৪৬	ʃikɽic	মশা	
৪৭	gogo	মা	
৪৮	t̪arin	ঘাড়	
৪৯	mu	নাক	
৫০	puk^{h}ri	পুকুর	
৫১	d̃ata	দাঁত	
৫২	ɟɔnʔ	ঝাড়ু	
৫৩	ĩɔʔ	আমি	
৫৪	abu	আমরা	
৫৫	ɟanoyar	পশু	
৫৬	d̪aʔ	পানি	

পরিশিষ্ট -২

চিত্র: ভারতবর্ষের ভাষাসমূহ (সূত্র: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)